সামাজিক বিজ্ঞান

(১ম ভাগ)

ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর।

ওড়িশা প্রাথমিক শিক্ষাকার্য্যক্রম প্রাধিকরণ
ভুবনেশ্বর

ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণী

সম্পাদক মণ্ডলী:

শ্রী প্রতাপকুমার পট্টনায়ক
ডঃ হরিহর পণ্ডা
শ্রী বিষ্ণুচরণ পাত্র
শ্রীমতী শৈলবালা পাঢ়ী

সমীক্ষক মণ্ডলী:

ডঃ শম্ভু প্রসাদ সামন্তরায়
শ্রী বৈষ্ণব চরণ দাস
শ্রী প্রতাপ কুমার পট্টনায়ক
শ্রীমতী রেণুবালা দাস
শ্রীমতী রত্নমঞ্জরী দাশ
প্রোফেসর ডঃ অশোক নাথ পরিডা
প্রোফেসর ডঃ সূর্য্যনারায়ণ মিশ্র
ডঃ হরেকৃষ্ণ সাহু
ডঃ পুষ্পাঞ্জলী পানী

সংযোজনা:

শ্রী সত্যজিৎ দাস মহাপাত্র
ডঃ মীনাক্ষী পণ্ডা
ডঃ তিলোত্তমা সেনাপতি

সংযোজনা:

ডঃ সবিতা সাহু

প্রকাশক:

বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ ওড়িশা সরকার

মুদ্রণ বর্ষ: ২০২২

মুদ্রণ:

পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়
ভুবনেশ্বর

প্রস্তুতি:

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয়
এবং রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ওড়িশা ভুবনেশ্বর।

জগৎমাতার চরণে অদ্যাবধি আমি যা যা উপঢৌকন ভেট দিয়ে আসছি, তাদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা, আমায় সব থেকে বেশী ক্রান্তিকারী ও মহত্ত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। এর থেকে বড় মহত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ভেট, আমি যে জগৎ সম্মুখে রাখতে পারবো, তা' আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। এর মধ্যে আছে আমার সমগ্র রচনাত্মক কার্য্যক্রমকে প্রয়োগাত্মক করার চাবিকাঠি। যে নতুন দুনিয়ার জন্যে আমি ছটফট করছি, তা' এ থেকেই উদ্ভব হতে পারবে। এটাই আমার অন্তিম অভিলাষ বললে চলে।

মহাত্মা গান্ধী

সামাজিক বিজ্ঞান

ইতিহাস বিভাগ

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	নতুন শক্তির অভ্যুত্থান	১
দ্বিতীয়	দিল্লীতে সুলতানী শাসন	২৬
তৃতীয়	মোগল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৭০৭)	৪৫
চতুর্থ	ইউরোপীয়দের ভারতে আগমন	৬২
পঞ্চম	ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ ভক্তি এবং সুফি ধর্ম আন্দোলন	৬৯
ষষ্ঠ	মোগল সাম্রাজ্যের পতন	৭৮
সপ্তম	ওড়িশায় সূর্য্যবংশী নরপতিগণ	৮২

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ

প্রথম	সংবিধান	৯১
দ্বিতীয়	স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতের সংবিধানের গঠন প্রক্রিয়া	৯৯
তৃতীয়	ভারতের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য	১০৪
চতুর্থ	মানবিক অধিকার	১১৬

প্রথম অধ্যায়

নতুন শক্তির অভ্যুত্থান

(ক) ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁদের উপাদান

যেকোনো সময়ের ইতিহাস রচনা করতে গেলে তার জন্য উপাদান আবশ্যক। ঐতিহাসিক উপাদানকে বিশ্লেষণ করে ইতিহাস রচনা করা হয়। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান আছে। সেইসব আধারিত করে ঐতিহাসিকগণ তুর্কী আক্রমণ, রাজপুতগণের অভ্যুদয়, গঙ্গবংশের শাসন, ভক্তি আন্দোলন, মোগল শাসন ও ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনের উপর আলোকপাত করেছেন।

সুলতান মামুদের শাসন সম্পর্কে ফিরদৌসির 'শাহনামা' সুচনা দেয়। মিনহাজ-উদ্দিন্-সিবজেব তবাকত্-ই-নাসিরীতে মহম্মদ ঘোরী, ইলতুৎমিস ও বলবন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া আমীর খুস্রুর 'তুঘলকনামা', মহম্মদ বিন্-তুঘলক-এর কার্য্যকলাপের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বাবরের আত্মচরিত, 'বাবরনামা' ও আবুল ফয়জলের 'আকবরনামা', যথাক্রমে মোগল শাসক বাবর ও আকবরের তথ্য প্রদান করে। এইভাবে মধ্যযুগে রচিত অনেক পুস্তক সেই সময়ের বিভিন্ন শাসক সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করে থাকে।

তুমি জানো কি?

- আমীর খুস্রুর 'খাজাইন্-উল-ফুতু' আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ্যজয়ের বর্ণনা।
- ফিরোজ শাহ তুঘলকের সম্পর্কে আফিফকা তারীখ-ই-ফিরোজশাহী পুস্তক অনেক সুচনা দেয়।
- হুমায়ুনের বোন গুলবদন বেগ্ 'হুমায়ুন নামা'তে হুমায়ুনের বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা করেছেন।
- এনায়েত খাঁয়ের 'শাহজাহানামা' থেকে মোগল সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।
- 'বাবরনামা'র অন্য নাম 'তুজুক্-ই-বাবরী'।

মোগলদের সময়ে রচিত ঐতিহাসিক কৃতিমান মোগল সম্রাটদের কোন কোন কার্য্যকলাপের বিষয়ে বর্ণনা করে থাকবে, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ 'তবাকত্-ই-নাসিরী' লিখেছিলেন। সেইরকম দিল্লির সুলতানদের বিষয়ে অন্য লেখকদের ঐতিহাসিক কৃতিমান অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

'বীজক' গ্রন্থে থাকা 'দোঁহা' থেকে কবীরের ধর্ম বাণীর সম্বন্ধে জানা যায়। 'আদি গ্রন্থ' ও 'গুরু গ্রন্থ সাহেব' থেকে নানকের নীতিবাণীর সম্পর্কে সূচনা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী 'চৈতন্য চরিতামৃত' পুস্তক থেকে জানা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের 'আমুক্ত মাল্যব' পুস্তক থেকে বিজয়নগর রাজ্য এবং এর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

তুমি জানো কি?

❖ দোঁহা: দু লাইনে লেখা একটি পদ। প্রত্যেক দোঁহাতে কেবল একটা ভাবই প্রকাশ পায়।

তোমার জানা অন্যান্য সন্তদের নাম ও তাঁদের রচিত পুস্তকের নাম লেখো।

গোয়ায় থাকা সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চের নথি থেকে ভারতে পর্তুগীজদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সূচনা পাওয়া যায়। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নথি থেকে ইংরেজদের প্রাথমিক কার্য্যকলাপের বিষয়ে জানতে পারা যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম (চিত্র)

তুমি জানো কি?

❖ অভিলেখা: একজন শাসকের সম্পর্কে ধারণা হয়। পাথর, তামারপাত এবং মুদ্রায় বিভিন্ন লিপিতে খোদাই করা থাকে।

ওড়িশার সোমবংশী ও গঙ্গবংশীদের ইতিহাস জানতে হলে, এই রাজবংশের রাজাদের অভিলেখা খুবই সহায়ক।

দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করা চোল, পাণ্ড্য, যাদব প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস জানতে হলে তাঁদের দ্বারা করা অভিলেখা থেকে জানা যায়। এই সব অভিলেখাতে রাজাদের রাজ্যজয়, শাসন-প্রণালী, ভূমিদান, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

তাম্র ফলক

মধ্যযুগে ছাপাখানা ছিল না। তাই পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হতে পারত না। একজন লেখকের পাণ্ডুলিপি দেখে সেটা অন্যজন লিখত। সেই লেখা অনুসরণ করে লেখার সময় অনেক অক্ষর পরিবর্তিত হয়ে যেত। কখনও অনুকরণকারী ব্যক্তি নিজের মন থেকে দু-চার লাইন তথ্য এতে লিখে দিত। এই ঐতিহাসিক প্রমাদ এখনও পর্য্যন্ত দূর করা সম্ভব হয়নি। ফলে অধিকাংশ লেখক, কবি এবং ঐতিহাসিকদের মূল লেখা হস্তগত হতে পারেনি। তবুও হস্তগত হওয়া গ্রন্থ থেকে আধার করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে।

পাণ্ডুলিপির অনুকরণ

বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথি অভিলেখাগারে সংগ্রহিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিকগণ সেসব পড়ে বিভিন্ন সময়ে ইতিহাস রচনা করেন। অধিকাংশ সময় তথ্য সম্বলিত তালপত্র পুঁথি এবং প্রাচীন পুস্তকের কাগজ উই পোকার খেয়ে নেবার সম্ভাবনা এবং ভয় থাকে। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এইসব মহামূল্য বস্তুদের সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে অভিলেখাগুলি আছে। সেসব পড়ে ইতিহাসকারেরা ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং ইতিহাস রচনা করতে হলে উপাদান যে নিতান্ত আবশ্যক তাতে সন্দেহ নেই।

মধ্যযুগে ছাপাখানা থাকলে কি সুবিধা হোত ?

তুমি জানো কি?
অভিলেখাগারে বহু নথিপত্র, দিনলিপি ও পুস্তক প্রভৃতি থাকে। গবেষকরা গবেষণার জন্য এখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন।

- তালপাতার পুঁথি ও অন্যান্য উপাদেয় পুস্তকগুলি কিভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারবে, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখ।
- আমাদের রাজ্যে কোথায় অভিলেখাগার আছে?

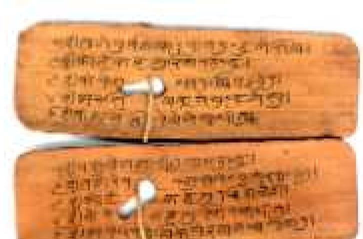
তালপাতার পুঁথি

(খ) তুর্কীদের আক্রমণ

দশম শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই অস্থির ছিল। বিভিন্ন রাজবংশের রাজারা পরস্পরের মধ্যে, হিংসা ও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এর সুযোগ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে তুর্কীরা ভারত আক্রমণ করেছিল। তাদের মধ্যে প্রথম ছিল গজনীর সুলতান মামুদ।

মামুদ গজনীর ভারত আক্রমণ

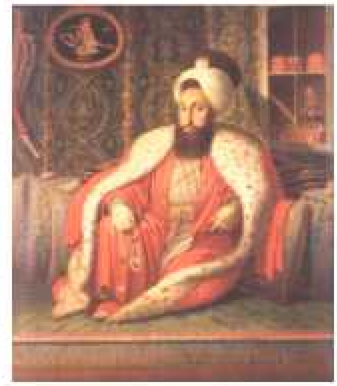
সুলতান মামুদ

দশম শতাব্দীতে আফগানিস্তানে আলপ্তগিন গজনী নামে এক ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল। ৯৭৭ সালে (খ্রীষ্টাব্দে) সাবুক্তগিন এই রাজ্যের শাসনকর্তা হলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সুলতান মামুদ ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি গজনীকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মধ্য এশিয়া জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছিল। তার জন্যে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী তিনি গঠন করলেন। ভারতের ধনরত্ন তাঁকে খুব প্রলোভিত করত। মামুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

গজনীকে শক্তিশালী করতে মামুদ আর কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলো, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মামুদ পাঞ্জাব, মুলতান, থানেশ্বর প্রভৃতি জয় করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি পাঞ্জাবকে নিজের রাজ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে বহু ধনরত্ন গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং লুণ্ঠন করে, ইসলাম ধর্মের গৌরব রক্ষা করা তাঁর চেষ্টার প্রয়াস ছিল।

সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করার সময় সেখানকার পুরোহিতরা মন্দির রক্ষা করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারত এক লুণ্ঠনকারী আক্রমণকারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। মামুদ কিন্তু গজনীর খুব উন্নতি করেছিলেন। সুন্দর এক মসজিদ ও পাঠাগার নির্মাণ করেছিলেন।

তুমি জানো কি?

- মামুদদের ১৭বার ভারত আক্রমণের মধ্যে অনেক রাজ্য যেমন- কাশ্মীর, বঙ্গ, বুন্দেলখণ্ড, আজমীরও আক্রমণ করেছিলেন।
- সোমনাথের আক্রমণের সময় গুজরাট সম্রাট ভীমদেব রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
- সোমনাথ মন্দির গুজরাটের কাথিওয়াড়া সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল।
- মামুদকে বাগদাদের খলিফা ইসলাম ধর্মের রক্ষক আখ্যা দিয়েছিলেন।

মামুদের দরবারে বহুজ্ঞানীগুণী মানুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন পারসিক কবি ফিরদৌসি। তিনি 'শাহনামা' নামক এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করে জনমানসে রয়েছেন। মামুদ 'আলবিরুণী' নামক একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে ভারত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে

পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভারতে অনেক বছর কাটিয়ে ভারতের ওপর এক সুন্দর পুস্তক রচনা করেছিলেন, যার নাম 'তহকিক্-এ-হিন্দ্'। অর্থাৎ ভারতের বিষয় যা সত্য।

তুমি মামুদের রাজ্য দরবারে ঐতিহাসিক বা কবিরূপে স্থান পেলে তাঁর চরিত্রকে কিভাবে ব্যক্ত করতে?

মামুদের মৃত্যুর পরে গজনী রাজ্যের গৌরব হারিয়ে গেল। তাঁর উত্তরাধিকারীরা দুর্বল হয়ে গেল। গজনীর পতন ঘটল। এরপরে আফগানিস্তানে ঘোর নামে অন্য এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর শাসক মহম্মদ ঘোরীও ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঘোর রাজ্যের শাসক মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেছিলেন। উত্তর ভারত জয় করে নিজের রাজ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া তাঁর পরম লক্ষ্য ছিল। ভারতের বিপুল ধনরত্নও তাঁকে আক্রমণের জন্য প্রলোভিত করেছিল।

মহম্মদ ঘোরী

মহম্মদ ঘোরী ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মূলতান অধিকার করে ভারত আক্রমণের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এর পরে তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব অধিকার করে দিল্লির দিকে অগ্রসর হলেন। দিল্লিতে তখন চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান শাসন করতেন। তিনি রাজপুতদের সংগঠিত করে তাঁদের সহায়তায় মহম্মদ ঘোরীকে ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিরোরী-তে পরাস্ত করেছিলেন। এটাই ছিলো প্রথম তিরোরী যুদ্ধ।

তুমি জানো কি?
মহম্মদ ঘোরীর অন্য নাম ছিল সাহাব্-উদ্-বিন মহম্মদ।

রাজপুতদের কি কি গুণের জন্য পৃথ্বীরাজ তাঁদের সাহায্য নিয়েছিলেন, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

পৃথ্বীরাজ চৌহান

মহম্মদ ঘোরী এই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। পুনর্বার ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করে দ্বিতীয় তিরোরী যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করে দিল্লী অধিকার করেছিলেন। এ সব দেখে কনৌজের রাঠোর বংশীয় শাসক জয়চন্দ্র রাজপুতদের একত্র করে মহম্মদ ঘোরীকে চান্দওয়ার (চান্দেরী) যুদ্ধ ক্ষেত্রে আক্রমণ করেছিলেন। মহম্মদ ঘোরী তাঁকে পরাস্ত করে ভারত থেকে বিপুল ধন-সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে গিয়েছলেন। ঘোরী ফিরে যাবার পর তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক্, বুন্দেল্ খণ্ড, কালিঞ্জর এবং মাহোবা অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁর অন্য তৃতীয় সেনাপতি বক্তিয়ারউদ্দিন খিলজী, বঙ্গ এবং বিহার অধিকার করেছিলেন। মহম্মদ ঘোরী ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

তুমি জানো কি?
মহম্মদ ঘোরীর মুখ্য সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীতে দাসবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল অন্যের কাছ থেকে জেনে লেখো।

❖ পৃথ্বীরাজের বীরত্বের কথা, চাঁদ বরদায়ী লিখিত, 'পৃথ্বীরাজ রাসো' গ্রন্থতে পাওয়া যায়।

(গ) প্রতিহার, চোল, পাণ্ড্য, হয়শাল ও যাদব বংশ:

ভারতের রাজনৈতিক পৃষ্ঠভুমিতে অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল। প্রতিহারেরা উত্তর ভারতে শাসন করতেন, দক্ষিণ ভারতে চোল, পাণ্ড্য হয়শাল এবং যাদব বংশের শাসকরা শাসন করতেন।

প্রতিহার, চোল, পাণ্ড্য, হয়শাল ও যাদব বংশের রাজ্য

প্রতিহার বংশ:

প্রতিহারেরা শক্তিশালী রাজপুত জাতি ছিলেন। প্রতিহার শব্দের অর্থ পাহারাদার। সে সময় উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে অনেক বহিঃশত্রু ভারতে প্রবেশ করত। তাদের প্রতিরোধ করে গিরিপথ পাহারা দেওয়ার কাজের জন্য বোধহয় তাঁদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

তুমি জানো কি?

❖ প্রতিহারদেরও গুর্জর প্রতিহার বলা হয়।

❖ প্রতিহারদের রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত ও পশ্চিমে কাথিওয়াড় থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

❖ 'কাব্য মীমাংসা' পুস্তক রাজশেখরের দ্বারা রচিত হয়েছিলো।

ভারতের মানচিত্র দেখে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির নাম লেখো।

প্রতিহার বংশের রাজাদের মধ্যে প্রথম মিহির ভোজ ছিলেন অন্যতম। তিনি ৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের দ্বারা তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র পাল ৮৯০ থেকে ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বঙ্গ বিজয় করে নিজের সাম্রাজ্য মিশিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিহারদের রাজধানী ছিলো কনৌজ।

প্রতিহারেরা বিষ্ণু ও সূর্য্যের উপাসক ছিলেন। তাঁদের রাজদরবারে বহু কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজশেখর অন্যতম।

চোলবংশ:

দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে সৃষ্ট হওয়া রাজ্যগুলোর মধ্যে চোল রাজ্য অন্যতম। রাজা প্রথম রাজরাজ ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চালুক্য, পাণ্ড্য ও চেরিদের পরাস্ত করেন। তিনি বেঙ্গী (অন্ধ্রের উপকূল অঞ্চল)ও অধিকার করেন। চেরিদের পরাস্ত করে তাদের কাছ থেকে এক বিশাল নৌবাহিনী ছিনিয়ে নেন। বিভিন্ন রাজ্য জয় করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। তিনি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যের জমি মাপার কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন।

> **তুমি জানো কি?**
> মুত্তারায়র নামক এক ছোট শাসক বংশ কাবেরী নদীর ত্রিকোণ ভূমি অঞ্চলে বসবাস করতেন। তাঁরা কাঞ্চিপূরম পল্লব রাজ বংশের করদ রাজা ছিলেন। উরায়ুরের চোল বংশের বিজয়ালয় মুত্তারায়রদের পরাস্ত করে তাঞ্জাভুর নগর স্থাপন করলেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা পল্লব ও পাণ্ড্য রাজ্য অধিকার করে চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

> মানচিত্র দেখে চোলদের রাজ্য ও তাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি চিহ্নিত করো।

প্রথম রাজরাজ ধর্মের ব্যাপারে সহনশীলতা অবলম্বন করতেন। তাঞ্জোরে অবস্থিত রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির ও বিষ্ণুমন্দির তাঁর অক্ষয় কীর্তি। তিনি আরও নাগপট্টমের কাছে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন। সমুদ্র পথে মশলা, মূল্যবান পাথর, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি মধ্য এশিয়ায় রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে নিজ রাজ্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

> ধর্মের ক্ষেত্রে সহনশীল হওয়ার জন্য একজন রাজার কিকি গুণ থাকা আবশ্যক, অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

প্রথম রাজরাজের পরে তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। পিতার মতো তিনিও একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর কালে নৌবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তিনি পল্লব এবং গঙ্গদের পরাস্ত করে ওড়িশার মধ্য দিয়ে সৈন্য চালনা করে গঙ্গানদীর কূলে পালেদের পরাস্ত করেন। তাঁর সুদৃঢ় নৌবাহিনীর ক্ষমতায় তিনি সিংহল অধিকার করেন। এর সাথে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি রাজ্য জয় করে, তিনি এক বিশাল চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা রাজেন্দ্র চোল ছিলেন জনমঙ্গলকারী রাজা। কৃষির উন্নতির জন্য অনেক খাল, হ্রদ ইত্যাদির সঙ্গে ছোট ছোট নদী বাঁধও নির্মাণ করেন। তাঁর আদেশে তাঁর রাজ্যে প্রচুর দেবদেবী ও রাজা রানীদের সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করা হয়। তাদের মধ্যে নৃত্যরত শিব বা নটরাজের মূর্তি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। চোল রাজাদের রাজধানী ছিলো তাঞ্জাপুর বা তাঞ্জোর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাধিকারগণ খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে মুসলমানের আক্রমণে চোল সাম্রাজ্যের পতন হয়।

নটরাজ

নদী বাঁধ হওয়ার ফলে লোকেদের কি কি উপকার হয়ে থাকবে, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

চোল সম্রাটদের নির্মিত মন্দিরগুলি ছিল জনবসতির কেন্দ্রবিন্দু। মন্দিরের চারিদিকে জনবসতি গড়ে উঠেছিলো। মন্দিরের অধীনে প্রচুর জমি থাকতো। মন্দিরের পূজক, মালাকার, পাচক, বাদ্য বাদক, নৃত্য পরিবেশনকারিণী ও অন্যান্যরা মন্দির নিকটবর্তী বসতিতে অবস্থান করতেন। কালক্রমে চোল রাজাদের মন্দিরগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছিলো।

চোল রাজাদের মন্দিগুলো কি কি কার্য্য সম্পাদন করতো, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

চোলেরা কৃষি ও জলসেচনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। কাবেরী নদী থেকে ক্যানেলের মাধ্যমে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। হ্রদ ও পুষ্করিণী খনন করেও জল সেচনের ব্যবস্থা করা হতো। চোলেদের উন্নত কৃষির ফলে রাজ্য শস্যশ্যামল হয়ে উঠতে পেরেছিলো।

চোলেরা এক উৎকৃষ্ট শাসনের প্রবর্তক ছিলেন। রাজা ছিলেন কেন্দ্র শাসনের মুখ্য। তাঁকে উপদেশ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়েছিলো। যুদ্ধ, রাজস্ব-আদায়, ন্যায়বিচার প্রভৃতি কেন্দ্রীয় শাসনের পরিসরভুক্ত ছিলো। কৃষকদের নিয়ে গড়ে ওঠা গ্রামকে 'উর্' বলা হতো। কয়েকটি উর্ নিয়ে একটি গ্রাম পরিষদ গড়ে উঠতো যার নাম ছিলো নাড়ু। বেল্লাল জাতির ধনী কৃষকেরা নাড়ুর শাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন।

বর্তমান শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে চোলেদের শাসন ব্যবস্থার এক তুলনাত্মক বিবরণী, বন্ধুদের সঙ্গে অলোচনা করে লেখো।

চোলরাজারা ব্রাহ্মণদের জমি দান করতেন। ব্রাহ্মণরা বসবাস করা গ্রামকে ব্রহ্মাদেয় বলা হতো। প্রত্যেক ব্রহ্মাদেয়র শাসন ব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত সভার দ্বারা পরিচালিত হতো। সভা বিভিন্ন কমিটি বা ভারিয়মের সদস্যদের নির্বাচিত করে, তাদের সাহায্যে গ্রামের পুকুর, বাগান, মন্দির, জলসেচন প্রভৃতির উন্নতিমূলক কার্য্য তদারক করা হতো। চোলেদের এই গ্রাম শাসন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো।

তুমি জানো কি?

ভারিয়মের সদস্যদের নির্বাচিত করার জন্যে লটারী প্রচলিত ছিলো। ছোট ছোট তালপাতায় অনেক ব্যক্তির নাম লিখে একটা পাত্রের মধ্যে রাখা হতো। কোনো বালক এসে হাত দিয়ে পাত্র থেকে পাতা বের করতো। যার নাম লেখা থাকতো, তিনিই নির্বাচিত হতেন।

পাণ্ড্যবংশ:

মধ্যযুগে পাণ্ড্যবংশ দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেছিলো। পাণ্ড্য রাজাদের মধ্যে প্রথম জটাবর্মন সুন্দব পাণ্ড্য (১২৫১-১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন শক্তিশালী। তিনি চের, চোল, হয়শাল, কাডভ এবং সিংহলীদের পরাস্ত করেছিলেন। তিনি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর পরে মারবর্মন কুলশেখর পাণ্ড্য (১২৬৮-১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ) শাসন করেছিলেন। তিনি তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল, এবং রামনাথ হয়শালকে পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তাঁর সময়েই ইতালীয় পরিব্রাজক মার্কোপোলো ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। কুলশেখরের পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা দুর্বল হয়ে পড়েন। মুসলমানদের আক্রমণে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাণ্ড্যদের পতন ঘটে।

ভারত ভ্রমণে আসা পরিব্রাজক মার্কোপোলোর মতো অন্য পরিব্রাজকের নাম বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী ছিলো মদুরা (তামিলনাড়ুর মদুরাই)। কয়াল ছিলো তাঁর রাজ্যের বৃহত্তম বন্দর। আরব সাগর ও চীন থেকে প্রচুর জাহাজ এখানে আসতো। এর ফলে অনেক বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে পাণ্ড্য রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। পাণ্ড্য রাজ্যের লোকেরা অধিকাংশ হিন্দু ধর্মের লোক ছিলো। রাজ্যে জৈন ধর্মের লোকের সংখ্যা খুব কম ছিলো। বৌদ্ধ ধর্মের কোনো প্রভাব সে রাজ্যে ছিলো না। নৌ বাণিজ্য ও বীরত্ব পাণ্ড্যদের স্মরণীয় করে রেখেছে।

কয়াল বন্দর কি কি কাজে ব্যবহার হতো, লেখো।

হয়শাল বংশ:

হয়শাল বংশ আধুনিক মহীশূর রাজ্যে শাসন করতো। এই বংশের রাজাদের মধ্যে বিট্টিগ বা বিষ্ণুবর্ধন ছিলেন অন্যতম। তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং দ্বার সমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয় বীরবল্লাক এই বংশের অন্যতম নৃপতি ছিলেন। তিনি চালুক্য ও যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তৃতীয় বীরবল্লাক ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানের আক্রমণে হয়শাল বংশের পতন ঘটে।

যাদব বংশ:

কল্যাণীতে রাজত্ব করা চালুক্যদের পতন ঘটার পরে দক্ষিণ ভারতে যাদব বংশের শাসন আরম্ভ হয়েছিলো। যাদবদের রাজধানী ছিলো দেবগিরি (মহারাষ্ট্রের দৌলতাবাদ শহর)। ভিলিম্মা এই বংশের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁর পুত্র জৈতুগী বা জৈত্রপাল, কাকতীয়দের যুদ্ধে পরাজিত করেন।

তুমি জানো কি?
দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণ ভারতের রাজাদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য অধিকার করেছিলেন।

জৈত্রপাল পরে সিংহতা যাদব বংশের রাজা হয়েছিলেন। যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের মাধ্যমে সে যাদব রাজ্যকে বিস্তৃত করেছিলেন। রামচন্দ্রদেব ছিলেন এই বংশের একজন শক্তিশালী রাজা। তাঁর সময়ে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের পরে শঙ্করদেব ও হরপালদেব শাসক হয়েছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান আক্রমণে যাদব বংশের পতন হয়েছিলো।

জৈত্রপাল নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

(ঘ) ওড়িশায় সোমবংশীয় শাসন; রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব।

দীর্ঘ দুশো বছর সোমবংশীয় শাসন ওড়িশার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলো। রাজনৈতিক স্থিরতার সঙ্গে ওড়িশার কলা ও স্থাপত্যকেও সমৃদ্ধ করেছিলো।

রাজনৈতিক কৃতিত্ব:

সোমবংশীরা ছিলেন চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয়। সোমবংশ কেশরী বংশ নামেও প্রসিদ্ধ। এই বংশের শাসক প্রথম জন্মেজয়ের আগে কিছু রাজা শাসন করলেও তাঁদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য নয়। ৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জন্মেজয় সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। তিনি ভঞ্জ বংশের রাজা রণভঞ্জ দেবকে পরাস্ত করেন। কলচুরীরাও তাঁর কাছে পরাস্ত হয়। তিনি নিজেকে 'পরমেশ্বর', 'পরম ভট্টারক' ত্রিকলিঙ্গাধিপতি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিলো সুবর্ণপুর। (বর্তমান-সোনাপুর)

জন্মেজয় বহু উপাধি বহন করার কথা তুমি জানলে। সে সময় রাজারা আর কি কি উপাধিতে ভূষিত হতেন, আলোচনা করে লেখো।

জন্মেজয়ের পরে প্রথম যযাতি ৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে সুবর্ণপুর থেকে বিনীতপুর এবং পরে যযাতি নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনিও কলচুরীদের পরাস্ত করেন। তিনি ভঞ্জদের পরাস্ত করে উৎকলে রাজত্ব করা ভৌমকারদের রাজ্যের কিছু অংশ দখল করেন।

ওড়িশার মানচিত্র এঁকে তাতে বিরজাক্ষেত্র চিহ্নিত করো।

প্রথম যযাতির পরে ভীমরথ, ধর্মরথ এবং নহুষ শাসন করেছিলেন। এর পরে দ্বিতীয় যযাতি ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ভৌমকারদের পরাজিত করে উৎকল অধিকার করেছিলেন। নিজেকে তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি কনৌজ থেকে ১০,০০০ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে জাজপুরে এনেছিলেন। তাঁর পরে উদ্যত কেশরী, দ্বিতীয় জন্মেজয়, পুরঞ্জয় আদি রাজারা শাসক হয়েছিলেন। সোমবংশের শেষ রাজা কর্ণদেব বা কর্ণকেশরীকে পরাস্ত করে ১১১০ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গবংশের রাজা চোড়গঙ্গদেব উৎকল অধিকার করে নিয়েছিলেন।

তুমি জানো কি?

- সোমবংশীদের সময়ে বিরজাক্ষেত্র একটি ধর্মপীঠ ছিলো।
- এই ক্ষেত্র জাজপুর জেলার বৈতরিণী নদীর কূলে অবস্থিত এবং বিরজা মন্দির, নাভিগয়া দশাশ্বমেধ ঘাট ও সপ্ত মাতৃকা পীঠের জন্য খ্যাত।

সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব:

সোমবংশীদের মন্দির নির্মাণশৈলী অতি সুন্দর ছিলো। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ্যের মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির, রাজারানী মন্দির এবং চণ্ডিখোলের মহাবিনায়ক মন্দির সোমবংশীদের অতুলনীয় কীর্তি। মন্দিরের স্থাপত্য এখনও পর্যটকদের মুগ্ধ করে রাখে। সে সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির বিখ্যাত। দ্বিতীয় যযাতির শাসনকালে এই মন্দির নির্মাণ হয়েছিলো। মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা প্রায় ৫৫ মিটার। মন্দির, জগমোহন, নাট-মন্দির ও ভোগ-মণ্ডপের সমন্বয়ে এই মন্দির গঠিত। এই বিরাট মন্দিরের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। লিঙ্গরাজ মন্দির কলিঙ্গ স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তুমি জানো কি?
ভুবনেশ্বরের রাজারানী মন্দিরে কোনো দেবতার পূজা হয় না।

তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দিরের নাম লিখে সেগুলি কি কারণে প্রসিদ্ধ লেখো।

লিঙ্গরাজ মন্দির

(ঙ) ওড়িশায় গঙ্গবংশের শাসন:

চোড়গঙ্গদেব, প্রথম নরসিংহদেব, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও কোনার্কের সূর্য্য মন্দির:

সোমবংশী শাসনের পরে ওড়িশায় গঙ্গবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘ তিনশো বছর গঙ্গদের এই শাসন। মধ্যযুগের ওড়িশাতে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলো। ওড়িশার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যগুলি যখন মুসলমান আক্রমণের শিকার হচ্ছিল, ওড়িশা ছিল ব্যতিক্রমী। গঙ্গদের বীরত্বের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ওড়িশা এক স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র ভাবে তিষ্টে ছিলো। গঙ্গদের স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও কোনার্কের সূর্য্য মন্দির আজও স্বমমিহায় দণ্ডায়মান।

চোড় গঙ্গদেব:

গঙ্গরা প্রথমে শ্রীকাকুলাম জেলার মুখলিঙ্গম অঞ্চলে শাসন করতেন। বজ্রহস্তদেব এবং তাঁর পরে রাজারাজদেবের প্রচেষ্টায় এই রাজবংশ শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। বংশধারা নদীর কূলে অবস্থিত কলিঙ্গনগর (বর্তমান আন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম জেলার মুখলিঙ্গম) ছিলো গঙ্গদের রাজধানী। রাজা রাজদেবের মৃত্যুর পরে চোড় গঙ্গদেব ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ ৭০ বছরের রাজত্বকালে ওড়িশা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। গঙ্গবংশীয় রাজত্ব অধুনা শ্রীকাকুলাম জেলায় আরম্ভ হয়েছিলো। 'কলিঙ্গনগর' চোড়গঙ্গদেবের রাজধানী ছিলো।

সাম্রাজ্য বিস্তার:

চোড় গঙ্গদেব একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সোমবংশের শেষ রাজা কর্ণদেবকে পরাজিত করে ওড়িশা অধিকার করেন ১১১০ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর বঙ্গ আক্রমণ করে আরম্য এবং রাঢ় অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি আরও দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গি রাজ্যকেও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। এর ফলে তাঁর রাজ্য উত্তরে গঙ্গানদী থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তিমি, বারঙ্গ, কটক, চৌদ্বার, জাজপুর এবং অমরাবতী (কটক জেলার ছতিয়া) স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে চোড় গঙ্গদেব নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ', 'ত্রিকলিঙ্গাধিপতি', 'শ্রীগঙ্গচূড়ামণি' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

তুমি জানো কি?

কোর্ণি তাম্রফলকের অভিলেখে চোড় গঙ্গদেবের রাজ্য জয়ের বর্ণনা আছে। এতে প্রথমে উৎকলপতি কর্ণ দেবকে পরাজিত করার কথা উল্লেখিত আছে।

রাজ্য শাসন:

চোড় গঙ্গদেব একজন সুশাসক ছিলেন। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা স্বরূপ আদায় করতেন। এছাড়া, বাণিজ্য কর, লবণ কর, বন্যজাত দ্রব্যের ওপর ধার্য্য করের ফলে, রাজ্যকোষে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সমাগম হতো। সেই সব অর্থ দিয়ে লোক হিতকর ও ধর্মের কাজ সম্পন্ন করা হতো। কিংবদন্তী বলে তিনি ভুবনেশ্বরের কাছে কৌশল্যা গঙ্গজলাশয় খনন করেছিলেন।

চোড় গঙ্গদেব যে সমস্ত কর আদায় করতেন, সে সব কি কি জনহিতকর কার্য্যে ব্যবহার করা হতো, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

চোড় গঙ্গদেব সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সময়ে সতানাদ 'ভাস্বতী' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন, যা স্বর্গীয় পিণ্ড ও চলনের সূচনা প্রদান করে। চোড় গঙ্গদেব ধর্মক্ষেত্রে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি শৈব হলেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পুরীর বিশ্ববিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ তাঁর কীর্তি। তাঁর সময় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক রামানুজ ওড়িশায় এসেছিলেন। চোড় গঙ্গদেব জাজপুরে গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির ও সীমাচলমে এক বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর বাণী কস্তুরী কামোদিনী টিকাল্লিতে এক জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

তুমি জানো কি ?

❖ চোড় গঙ্গদেব পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করার কথা দাসগোবা অভিলেখা থেকে জানা যায়।

❖ সতানাদ 'ভাস্বতী'তে স্বর্গীয় পিণ্ডগুলির স্থিতি ও চলন সম্পর্কে লিখেছিলেন। সেইভাবে ওড়িশার কোন বরপুত্র গ্রহ-নক্ষত্রদের ওপর যদি কোনো পুস্তক লিখে থাকে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

চোড় গঙ্গদেব ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী বীর। উৎকল অধিকার করার পর প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, আলোচনা করে লেখো।

প্রথম নরসিংহদেব:

প্রথম নরসিংহদেব ছিলেন গঙ্গবংশের প্রখ্যাত নরপতি। তিনি ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে গঙ্গ সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। ওড়িশার ইতিহাসে তিনি লাঙ্গুলা নরসিংহদেবরূপে সুপরিচিত।

রাজ্য জয়:

প্রথম নরসিংহদেব একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি বঙ্গের শাসক তুঘ্রিল তুধান খাঁকে পরাস্ত করে বঙ্গের বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর অঞ্চল ওড়িশা সাম্রাজ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তেলেঙ্গানার রাজা গণপতিকেও পরাস্ত করেন। তাঁর সময়ে গঙ্গ সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলো।

তুমি জানো কি ?

প্রথম নরসিংহদেবকে লাঙ্গুলা নরসিংহদেব বলা হয়। তিনি হাঁটার সময় তাঁর রাজকীয় পোশাক পেছন দিয়ে লম্বা হয়ে মাটি স্পর্শ করে থাকতো। অনেকটা লেজের মতো বলে লোকে এরকম বলতো।

প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্যজয়ের পেছনে কি কি ইচ্ছা ছিলো, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

রাজ্য শাসন:

প্রথম নরসিংহদেব একজন সুশাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে, সাহিত্য কলা ও স্থাপত্যের প্রভূত বিকাশ ঘটেছিলো। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। বিদ্যাধর তাঁর রাজসভার বিখ্যাত কবি ছিলেন। কবি বিদ্যাধর 'একাবলী' নামক এক প্রসিদ্ধ অলংকার শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সাহিত্য দর্পণে'র রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। প্রথম নরসিংহদেব বিখ্যাত কোনার্কের সূর্য্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বালেশ্বর জেলার রেমুনায় অবস্থিত ক্ষীরচোরা মন্দির তাঁর কীর্তি। তিনি ভুবনেশ্বরের সদাশিব মঠ নির্মাণ করেছিলেন। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নরসিংহদেবের মৃত্যু হয়।

প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্যে তুমি একজন প্রজা হলে কি কাজ করতে এবং কেন করতে আগ্রহ সহকারে লেখো।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির:

পুরীর জগন্নাথ মন্দির চোড় গঙ্গদেবের এক অমর কীর্তি। কলিঙ্গ স্থাপত্যের এক বাস্তব পরিপ্রকাশ। জগন্নাথ মন্দিরের কারুকার্য্য অতি উচ্চশ্রেণীর ও রমণীয়। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৬৫ মিটার। এই মন্দিরটি এক বিরাট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যা 'মেঘনাদ' প্রাচীর নামে খ্যাত। মন্দিরে প্রবেশের জন্য চারিদিকে চারটি প্রবেশদ্বার আছে। মন্দিরের পূর্বদিকের দ্বারের সম্মুখে ১২ মিটার উঁচু স্তম্ভ আছে। এর নাম অরুণ স্তম্ভ। জগন্নাথ মন্দিরে বলরাম, সুভদ্রা এবং জগন্নাথের মূর্তি শোভিত রয়েছে।

তুমি জানো কি ?

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের যে চারটি দ্বার আছে, তাঁদের নাম যথাক্রমে—দক্ষিণদ্বারকে অশ্বদ্বার, উত্তরদ্বারকে হস্তীদ্বার, পূর্বদ্বারকে সিংহদ্বার ও পশ্চিমদ্বারকে ব্যাঘ্রদ্বার বলা হয়।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

মন্দির বেষ্টনীর ভেতরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, নৃসিংহ মন্দির, বিমলা মন্দির, মহালক্ষ্মী মন্দির, নবগ্রহ মন্দির প্রভৃতি ছোট ছোট মন্দির আছে। মুক্তি মণ্ডপ এবং আনন্দবাজার পুরী জগন্নাথ মন্দিরের দুটি আকর্ষণীয় স্থান। পুরীকে 'শ্রীক্ষেত্র' এবং 'শঙ্খ ক্ষেত্র' নামে নামকরণ করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা বিশ্ববিখ্যাত।

পুরীকে যেমন শ্রীক্ষেত্র রূপে বলা হয়, তেমনি ওড়িশার আর কোন কোন স্থান কি ক্ষেত্রভাবে বর্ণনা করা হয় আলোচনা করে লেখো।

কোনার্কের সূর্য্য মন্দির:

কোনার্কের প্রসিদ্ধ সূর্য্য মন্দির প্রথম নরসিংহদেব রাজার অম্লান কীর্তি। চন্দ্রভাগা নদীর মোহনার কাছে বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মনোরম সূর্য্য মন্দির নির্মিত হয়েছিলো। কিংবদন্তী অনুসারে এই মন্দির নির্মাণ কার্য্যে ১২০০ কারিগর নিযুক্ত হয়েছিলো। রাজা নরসিংহদেবের মন্ত্রী শিবেই সামন্তরায় এবং তখনকার প্রসিদ্ধ শিল্পী বিশু মহারানার তত্ত্বাবধানে মন্দির নির্মিত হয়েছিলো। বিশু মহারানার ১২ বছরের পুত্র ধরমা এই মন্দিরের চুড়ো স্থাপন করেছিলো।

কোনার্কের সূর্য্য মন্দির

তুমি কোনার্কের মন্দির নির্মাণ কালের শিল্পী হলে একে আরও সুন্দর করার জন্যে কি কি করতে?

কোনার্ক মন্দির সূর্য্যের রথের আকারে নির্মিত। এতে ২৪টা চাকা ও ৭টি ঘোড়া আছে। মন্দিরে বড় বড় লোহার কড়ি ও পাথর ব্যবহার হয়েছে। কোনার্কের মুখ্য মন্দির এখন ভগ্ন দশায় আছে। তাতে সূর্য্যদেবের সিংহাসন দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির গাত্রে বিভিন্ন দেবদেবী, গান্ধর্ব, নর্তকী, পরী, বৃক্ষলতা, পুষ্প ও যুদ্ধের চিত্র খোদাই করা আছে। মুখ্য মন্দিরের সামনের কালো মুগুনি পাথরে তৈরী নবগ্রহ মূর্তি এখন মন্দিরের বাম পার্শ্বে নির্মিত নবগ্রহ মন্দিরে স্থাপিত হয়েছে।

তুমি জানো কি?
কোনার্ক মন্দিরে অন্য চিত্রর সঙ্গে একটা জিরাফের চিত্রও আছে।

কোনার্ক মন্দির পরিসরে থাকা ছায়াদেবীর মন্দির, গজ সিংহ ও যুদ্ধশ্বরের মূর্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কোনার্ক মন্দিরের পরিসরে থাকা মূর্তি এবং এর সৌন্দর্য এখনও দেশ বিদেশের পর্য্যটকদের বিমোহিত করে।

- কোনার্ক মন্দির নির্মাণে ব্যবহৃত হওয়া বড় বড় পাথর কিভাবে ওপরে তোলা হতো এবং জোড়া হতো—অনুমান করে লেখো।
- কোনার্ক মন্দিরে থাকা ২৪টি চাকা ও ৭টি ঘোড়া কার প্রতীক, অন্যদের সঙ্গে অলোচনা করে লেখো।

প্রথম নরসিংহদেবের পরে প্রথম ভানুদেব, দ্বিতীয় নরসিংহদেব, দ্বিতীয় ভানুদেব প্রমুখ রাজাগণ শাসন করেছিলেন। চতুর্থ ভানুদেব বা মত্ত ভানুদেব ছিলেন গঙ্গবংশের সর্বশেষ রাজা। ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। এর সঙ্গে গঙ্গবংশর লোপ পেলো এবং সূর্য্যবংশী গজপতিদের শাসনকাল আরম্ভ হলো।

(চ) নতুন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি:

নতুন ভাষা ও লিপির জন্ম, কলার ক্ষেত্রে নতুন শৈলীর প্রবর্তন।

নতুন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি:

মধ্যযুগে ভারতে ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছিলো। বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে যাওয়ার সঙ্গে জৈন ধর্মের প্রভাবও হ্রাস পেয়েছিলো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সংস্কার আসার সহিত ভক্তিভাবের জন্ম ও প্রসার বেড়ে ছিলো। এই সময় বহু ধর্ম সংস্কারের আবির্ভাব হয়েছিলো। তাঁদের অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতে জন্ম হলেও সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় হয়েছিলো। উত্তর ভারতেও অনেক ধর্ম সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে কেন ভক্তিবাদের সৃষ্টি হয়েছিলো, আলোচনা করে লেখো।

দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করা ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য অন্যতম। তিনি ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরলের কালাডিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতবাদকে 'অদ্বৈত মতবাদ' বলা হয়। তিনি সমগ্র জগৎকে মিথ্যে ও ব্রহ্ম (ঈশ্বর)-কে সত্য বলে বর্ণনা করেছিলেন। জ্ঞানের বলে ঈশ্বর প্রাপ্ত হয় বলে তিনি প্রচার করতেন। ভারতে বহু ধর্মপীঠ ও মঠ তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠা হয়। ওড়িশায় পুরীতে তিনি এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জন্যেই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। কিন্তু মাত্র ৩২ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

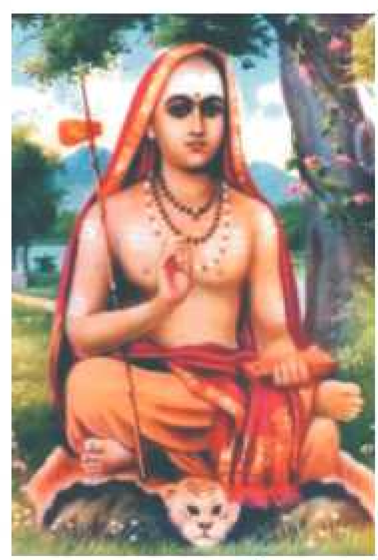
শঙ্করাচার্য্য

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভক্তিবাদের প্রচার করতেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করার কথা বলতেন। প্রেম ও ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় বলে তিনি প্রচার করতেন। জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে তিনি প্রচার করতেন।

শঙ্করাচার্য্যের চেয়ে রামানুজের মত ভিন্ন ছিলো। তাঁর মতে মানুষ একটাই জাতি। তাতে উঁচু নীচুর স্থান নেই। তাঁর এই বাণী বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছিলো। রামানুজের প্রধান শিষ্য ছিলেন রামানন্দ। তিনি রামানুজের ভক্তিবাদ উত্তর ভারতে প্রসার করিয়েছিলেন। তিনি রামানুজের আদর্শ এবং নীতিময় জীবন যাপন লোকেদের কাছে উপস্থাপন করতেন।

তুমি জানো কি?

❖ শংকরাচার্য্য ভারতে চরটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। সেগুলো হলো পুরীতে গোবর্ধন মঠ, বদ্রীনাথের জ্যোতি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ এবং কর্ণাটকের শৃঙ্গের মঠায় শৃঙ্গেরী মঠ।

শংকরাচার্য্যের মত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত থাকার সময় রামানুজের ভক্তিবাদ লোকেরা কেন গ্রহণ করলো, আলোচনা করে লেখো।

ভক্তিবাদের সন্তগণ আঞ্চলিক ভাষায় ভজন ও প্রার্থনা রচনা করে ঈশ্বরকে আরাধনা করতেন। সমাজের সর্বপ্রকার লোকজন এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত উভয় স্থানেই এই ভক্তিবাদের প্রসার ঘটেছিলো। এই ভক্তিবাদ কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করেছিলো।

তুমি জানো কি?

❖ জনশ্রুতি অনুসারে ভক্তি দ্রাবিড় উপুজি লায়ে, রামানন্দ পরগট কিয়া কবীরণে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড অর্থাৎ ভক্তিবাদ দক্ষিণে জন্ম নিলো। একে রামানন্দ উত্তর ভারতে আনলেন এবং কবীর সর্বত্র প্রচার করলেন।

ভক্তিবাদের সন্তগণ আঞ্চলিক ভাষায় ভজন ও প্রার্থনা রচনা করেছিলেন। তুমিও তোমার অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ভজন ও প্রার্থনা সংগ্রহ করে এক তালিকা ও বিবরণী প্রস্তুত করো।

এই সময় উত্তর ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। রামানুজের সমসাময়িক নিম্বার্ক দক্ষিণ ভারতে জন্মালেও উত্তর ভারতের মথুরাতে অবস্থান করতেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। কৃষ্ণের বাল্যকাল, রাধার প্রেম, কংসের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা প্রচার করে তিনি লোকেদের আকর্ষিত করতেন। কৃষ্ণের সম্পর্কিত এই কাহিনীগুলো পদ্য আকারে রচিত হয়ে মন্দির গাত্রে স্থান পেলো। এর ফলে কৃষ্ণলীলা সমগ্র উত্তর ভারতে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

জানো কি?

শিবের উপাসক শৈব, বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব, এবং শক্তির (দেবী) উপাসক শাক্তরূপে পরিচিত।

এই সময় ওড়িশায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও প্রসার ঘটেছিলো। সোমবংশী শাসকগণ শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। গঙ্গদের সময় জগন্নাথ উপাসনা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। জগন্নাথ সর্ব ধর্মের সমন্বয় বলে লোকেদের ধারণা হয়েছিলো।

জগন্নাথ কেন সর্বধর্মের সমন্বয়, তা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

নতুন ভাষা ও লিপির জন্ম:

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস গৌরবময়। এই সময় অনেক নতুন ভাষা ও লিপি সৃষ্টির সাথে সাথে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশও ঘটেছিলো।

দক্ষিণ ভারতে মূলত দুটি ভাষা প্রচলিত ছিলো। প্রথমটি সংস্কৃত ও অন্যটি নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া আঞ্চলিক ভাষা। সংস্কৃত ভাষা বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্ররা ব্যবহার করতেন। তা ছাড়া ধর্মানুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হতো। আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক চল চোল রাজ্যে দেখা যেত। সেখানে তামিল আঞ্চলিক ভাষা রূপে প্রচলিত ছিলো। তামিল ভাষা বহুলাংশে সংস্কৃত ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। তামিল ভাষার সঙ্গে লিপির প্রণয়ন করে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কম্বান দ্বারা রচিত তামিল রামায়ণ সেই সময়ের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই সময় বহু নাটক ও কবিতা সৃষ্টি হয়েছিল।

তুমি কতগুলি আঞ্চলিক ভাষা জানো লেখো।

এই সময় অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু ভাষা ও লিপি প্রচলিত ছিলো। তেলেগু ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছিলো। নানায় দ্বারা রচিত মহাভারত তেলেগু সাহিত্যের অম্লান সৃষ্টি। পরবর্তীকালে টিকানা নামে এক কবি একে অন্ধ্রে জনপ্রিয় করেছিলেন।

তোমার অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকে কি উপায়ে জনপ্রিয় করা যেতে পারে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মহীশূরে এই সময় কন্নড় ভাষার সৃষ্টি হয়েছিলো। লিঙ্গায়েত গোষ্ঠীর কয়েকজন সন্ত সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে কন্নড় ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। পম্পা, পোনা ও রাজা, কন্নড় সাহিত্যের বিখ্যাত স্রষ্টা।

তোমার অঞ্চলের বিখ্যাত কবি ও লেখকদের নাম লিখে তাঁদের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

এই সময় উত্তর ভারতে বহু আঞ্চলিক ভাষা ও লিপি জন্ম নিয়েছিলো। সাধারণ লোকেদের ব্যবহৃত অপভ্রংশ ভাষা থেকে এদের উৎপত্তি হয়। পশ্চিম ভারতে মারাঠা ও গুজরাতি ভাষা, লোকেদের কথিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হতো। ওড়িশায় ওড়িয়া ভাষা এই সময় সৃষ্টি হয়। চর্য্যাগীতিকা এই সময়ের সৃষ্টি।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা কোন কোন ভাষায় কথা বলেন, তা লেখো।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে নূতন শৈলীর প্রবর্তন:

কলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নতুন শৈলীর প্রবর্তন এই যুগের বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ভারতে প্রথমে পাথর কেটে তার মধ্যে মন্দির নির্মাণ করা হতো। এই সময়েই পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে মন্দির স্বতন্ত্রভাবে গড়া হলো। এতে মাত্র দুটো ঘর থাকতো। একটা প্রধান উপাসনার ঘর ও অন্যটি প্রবেশ ঘর। ক্রমে ক্রমে একাধিক ঘর তৈরী করা হতে লাগলো। মন্দিরের চারদিকে প্রাচীর দেওয়া হতে লাগলো। মন্দিরের প্রবেশদ্বার নির্মিত হলো, যা গোপুরম নামে বিখ্যাত। মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে ছোট ছোট মন্দির নির্মাণ করে বিভিন্ন দেবদেবী ও সাধুসন্তদের মূর্তি রেখে পূজা করা হতে লাগলো। প্রধান মন্দিরটি বৃহৎ আকারের নির্মাণ করা হলো।

তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বরের মন্দিব

মন্দিরের প্রাচীর না থাকলে কি ধরনের অসুবিধে হতো, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

চোলদের দ্বারা নির্মিত মন্দিরগুলি, বৃহৎ সুন্দর, এবং আকর্ষণীয় ছিলো। তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বরের মন্দির এবং গঙ্গইকোন্ডা চোলপুরম স্থানের মন্দির তাঁদের অক্ষয় কীর্তি। সেই সব মন্দিরের মূর্তি, পাথর বা ব্রোঞ্জের হতো। তখনকার কালে চোলেদের তৈরী ব্রোঞ্জের মূর্তি পৃথিবী বিখ্যাত।

ব্রোঞ্জের পরিবর্তে অন্য ধাতু ব্যবহার করে মূর্তি করে মন্দিরে স্থাপন করলে কি কি সুবিধে ও অসুবিধে হবে, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

চোলদের সময়ের ব্রোঞ্জ মূর্তি

সেই সময় মধ্যভারতে চান্দেল রাজাদের নির্মিত খাজুরাহো মন্দির, তার কারুকার্যের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে নির্মিত দিলওয়ারা জৈন মন্দির মার্বেল কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। ওড়িশায় এই সময়ে ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দির, পুরীতে জগন্নাথ মন্দির এবং কোনার্কে সূর্য্য মন্দির নির্মিত হয়েছিলো। এই মন্দিরগুলি কলিঙ্গ স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন।

ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দির

ওড়িশার কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের নাম লেখো। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট মন্দিরের নাম লেখো।

আমরা কি শিখলাম

- ইতিহাস রচনা করতে হলে বহুবিধ উপাদান আবশ্যক।
- মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার জন্য শাহনামা, বাবরনামা, আমুক্ত মাল্যব এবং অন্যান্য অভিলেখা দরকার।
- সুলতান মামুদ ১৭বার ভারত আক্রমণ করে সোমনাথ মন্দির লুঠ করেছিলেন।
- মহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয় তিরোরী যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করেছিলেন।
- কনৌজ প্রতিহারীদের রাজধানী ছিলো।
- চোলদের শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিলো ও তাঁদের উৎকৃষ্ট শাসন ছিলো। পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিলো মদুরা। তাঁদের সময়েই মার্কোপোলো ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। হয়শালদের রাজধানী দ্বার সমুদ্র ছিলো এবং দ্বিতীয় বীর বল্লাল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।
- যাদবদের রাজধানী দেবগিরি ছিলো।
- ওড়িশায় সোমবংশের জন্মেজয়, প্রথম যযাতি, দ্বিতীয় যযাতি, কর্ণ প্রমুখ রাজাগণ শাসন করতেন।
- ওড়িশায় গঙ্গবংশের রাজা চোড় গঙ্গদেব পুরীতে জগন্নাথ মন্দির ও প্রথম নরসিংহদেব কোনার্কের সূর্য্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।
- শংকরাচার্য্য, রামানুজ, রামানন্দ, নিম্বার্ক প্রমুখ আধ্যাত্মিকবাদীগণ তাঁদের মত প্রচার করেছিলেন।
- আঞ্চলিক ভাষারূপে তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষার বিকাশ ঘটেছিলো।
- নতুন শৈলীতে মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারত, মধ্য ভারত ও ওড়িশায় বিভিন্ন মন্দির নির্মাণ হয়েছিলো।

প্রশ্নাবলী — ১

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

(ক) অধিকাংশ মধ্যযুগীয় লেখক, কবি ও ঐতিহাসিকদের মূল লেখা কেন হস্তগত হতে পারেনি?

(খ) মামুদের দরবার সম্পর্কে কি জানো লেখো।

(গ) মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের বিষয়ে লেখো।

(ঘ) চোলদের রাজ্য শাসন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

(ঙ) যাদব বংশের রাজাদের কৃতিত্বের বিষয়ে লেখো।
(চ) প্রথম জন্মেজয়ের কৃতিত্বের বিষয়ে আলোচনা করো।
(ছ) সোমবংশীদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করো।
(জ) চোড় গঙ্গদেবের রাজ্য জয়ের সম্বন্ধে লেখো।
(ঝ) প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্য শাসনের সম্পর্কে সম্যক ধারণা দাও।
(ঞ) পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণশৈলী সম্পর্কে লেখো।
(ট) রামানুজের মতবাদ সম্পর্কে লেখো।
(ঠ) দক্ষিণ ভারতের সৃষ্টি হওয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করো।
(ড) মধ্যযুগীয় ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের বিষয়ে উল্লেখ করো।

২. ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো:

(ক) সুলতান মামুদের সম্পর্কে আমীর খুস্রুর খাজাইন-উল-ফুতু বর্ণনা করেছে।
(খ) ওড়িশায় সোমবংশীদের শাসনের কথা সাহিত্য উপাদানে জানা যায়।
(গ) প্রতিহারগণ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন।
(ঘ) দ্বিতীয় বীরবল্লাল পাণ্ড্য বংশের শাসক ছিলেন।
(ঙ) সোমবংশীরা সূর্য্যবংশীয় শাসক ছিলেন।
(চ) মুক্তেশ্বর মন্দির গঙ্গদের বিশিষ্ট কীর্তি।
(ছ) সতানন্দের 'ভাস্বতী' সূর্য্যবংশী গজপতি কপিলেন্দ্রদেবের সময় রচিত হয়েছিল।
(জ) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের অনন্য কীর্তি।
(ঝ) নিম্বার্ক অদ্বৈত মতবাদ প্রচার করেছিলেন।
(ঞ) নানায় কন্নড় ভাষায় মহাভারত রচনা করেছিলেন।
(ট) লিঙ্গায়ত গোষ্ঠীর সন্তগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন।
(ঠ) বিহারের আবু পর্বতে থাকা দিলওয়ারা জৈন মন্দির তার মার্বেল কলার জন্য প্রসিদ্ধ।

৩. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো:

(ক) তুঘলকনামা —— দ্বারা রচিত হয়েছিলো।
(ফিরদৌসি, আবুল ফয়জল, আমীর খুস্রু, ইনায়েৎ খাঁ)
(খ) সুলতান মামুদ —— বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।
(১৪, ১৫, ১৬, ১৭)
(গ) পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে —— যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন।
(প্রথম তিরোরী, দ্বিতীয় তিরোরী, চান্দেরী, হলদীঘাট)
(ঘ) মহেন্দ পাল —— বংশের রাজা ছিলেন।
(পাল, প্রতিহার, পাণ্ড্য, চোল)
(ঙ) চোলেদের রাজধানী —— ছিলো।
(তাঞ্জোর, কনৌজ, মাদুরা, দ্বারসমুদ্র)

(চ) ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ———র সময়ে নির্মিত হয়েছিলো।

(প্রথম জন্মেজয়, প্রথম যযাতি, দ্বিতীয় যযাতি, কর্ণদেব)

(ছ) 'ভাস্বতী' নামক গ্রন্থ——— রচনা করেছিলেন।

(বিদ্যাধর, সতানন্দ, সারলা দাস, জগন্নাথ দাস)

(জ) কাম্বান ——— ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

(তেলেগু, তামিল, কন্নড়, ওড়িয়া)

(ঝ) গোপুরম ——— ভারতীয় মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়

(উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম)

(ঞ) ——— কলিঙ্গ স্থাপত্যের নিদর্শন।

(সোমনাথ মন্দির, রাজেশ্বর মন্দির, দিলওয়ারা মুক্তেশ্বর মন্দির)

(ট) ——— অদ্বৈত মতবাদের প্রচারক।

(রামানন্দ, রামানুজ, শংকর, নিম্বার্ক)

৪. 'ক' স্তম্ভের খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের ঘটনাকে সঠিকভাবে জুড়ে বাক্য লেখো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ	প্রথম নরসিংহদেবের সিংহাসন আরোহণ।
১০২৫ খ্রীষ্টাব্দ	চোড় গঙ্গদের উৎকল অধিকার।
১১১০ খ্রীষ্টাব্দ	প্রথম মিহির ভোজের সিংহাসন আরোহণ।
১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দ	সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন।
৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ	দ্বিতীয় তিরোরী যুদ্ধ।

৫. সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো।

প্রথম তিরোরী যুদ্ধ, প্রথম রাজরাজার রাজ্যজয়, সভার কার্য্য, কয়াল বন্দর প্রথম যযাতির রাজ্যজয়, চোড় গঙ্গদেবের দুর্গ নির্মাণ, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, শংকর, রামানুজ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, গোপুরম, তেলেগু ভাষার সাহিত্য।

৬. প্রথম তিরোরী যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় তিরোরী যুদ্ধের এক তুলনাত্মক বিবরণী লেখো।

৭. চোল, পাণ্ড্য, হয়শাল, যাদব এবং প্রতিহার বংশের রাজাদের তালিকা প্রস্তুত করো।

৮. মহম্মদ ঘোরী এবং মামুদ গজনীর ভারত আক্রমণের মধ্যে তুমি কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভাবছো এবং কেন ?

৯. মানচিত্র এঁকে চোল, পাণ্ড্য এবং হয়শালদের রাজ্য চিহ্নিত করো।

১০. শংকর এবং রামানুজের মত সম্পর্কে আলোচনা করে তুমি কাকে এবং কেন প্রাধান্য দেবে লেখো।

১১. পঠিত বিষয় থেকে আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত সাহিত্যের তালিকা তৈরি করো।

তোমার জন্য কাজ

মুক্তেশ্বর, অনন্ত বাসুদের, মহা বিনায়ক ও এই রকম অন্য তিনটি মন্দিরের চিত্র সংগ্রহ করে, সেগুলো কোথায় অবস্থিত দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিল্লীতে সুলতানী শাসন

দিল্লীতে তুর্কী সুলতানেরা ৩০০ বছর শাসন করেছিলেন। এই সুলতানেরা দিল্লীকে তাঁদের রাজধানী করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত উপমহাদেশের অনেক অঞ্চল নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। সর্ব মোট ৫টি রাজবংশ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে সুলতানী শাসন করেছিলেন। এই সময়কাল ভারতে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলো।

তুমি জানো কি?
যখন এক পরিবারের একজনের পর আর একজন রাজত্ব করে, সেই পরিবারকে রাজবংশ বলা হয়।

দিল্লীতে সুলতানী শাসন:

টেবিল ১

তুর্কী শাসন (১২০৬-১২৯০)
কুতুবুদ্দিন আইবেক্ (১২০৬-১২১০)
সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬)
রাজিয়া সুলতান (১২৩৬-১২৪০)
গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

ইলতুৎমিস কবর

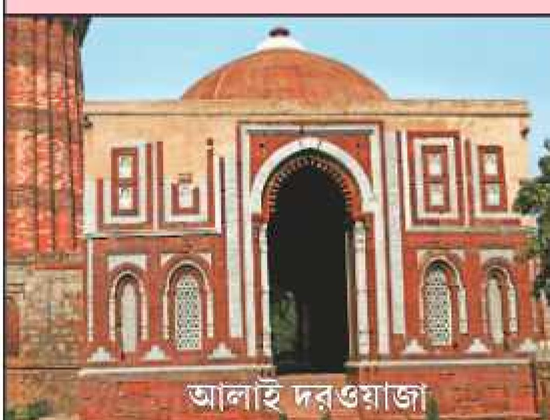
আলাই দরওয়াজা

খিলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)
জালালউদ্দিন খিলজী (১২৯০-১২৯৬)
আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬)

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৪)
গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৪)
মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৪-১৩৫১)
ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮)

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১)
খিজির খান (১৪১৪-১৪২১)

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)
বাহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)
সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১২)
ইব্রাহিম লোদী (১৫১২-১৫২৬)

ফিরোজ শাহ তুঘলকের কবর

টেবিল ১ দেখে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসক রাজবংশ সম্রাট ও তাঁদের শাসনকালের সময় তালিকা প্রকাশ করো।

ভারতে তুর্কী শাসন (১২০৬-১২৯০)

দিল্লীতে সুলতানী শাসনের ভিত্তি স্থাপন দাস বংশের হাতে হয়েছিল। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে কয়েকজন নিজে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসের সন্তান ছিলেন। সেই জন্য এদের প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাস বংশ বলা হয়। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুতুবুদ্দিন আইবেক্, ইলতুৎমিস, রাজিয়া সুলতান ও বলবন দিল্লীতে সিংহাসনে বসে শাসন করেছেন।

তুমি জানো কি ?

আরব ও তুর্কীরা উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন দাসেদের কেরানী, সৈনিক ও প্রশাসকের পদে নিযুক্ত করতো। এই দাসেরা ভালো কাজ করে মালিককে খুশি করতে পারলে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতো।

কুতুবুদ্দিন আইবেক্ : (১২০৬-১২১০)

কুতুবুদ্দিন আইবেক্ দাসবংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন। তাঁর হাতেই দাসবংশের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিলো। তিনি সম্রাট হওয়ার আগে মহম্মদ ঘোরীর দাস ছিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিলো। তাই মহম্মদ ঘোরী তাঁকে সেনাধ্যক্ষ করে উত্তর ভারত জয় করতে পাঠিয়েছিলো। কুতুবুদ্দিন আইবেক্ সম্রাট হবার আগে দিল্লী কোলি (আলিগড়) কনৌজ, বিহার ইত্যাদি রাজ্য জয় করেছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র না থাকায় ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে হাসান নিজমি অন্যতম। তিনি দিল্লীতে ও আজমীরে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লীর কুতুবমিনার নির্মাণ তার দ্বারা আরম্ভ হয়েছিলো। পোলো খেলার সময় ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুতুবুদ্দিন আইবেক্

তুমি জানো কি ?

কুতুবুদ্দিন আইবেক মাত্র ৪ বছর রাজত্ব শাসন করেছিলেন। তিনি দিল্লীতে কাত-উল-ইসলাম ও আজমীরে ঢাই দিনকা ঝোপড়ি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কুতুবমিনার দিল্লীর মেহে রেলিতে অবস্থিত।

বর্তমানে দিল্লীতে সুলতানদের তৈরী কি কি মসজিদ আছে, অন্যদের জিজ্ঞাসা করে লেখো।

ইলতুৎমিস: (১২১০-১২৩৬):

কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁর জামাই ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার পূর্বে তিনিও ক্রীতদাস ছিলেন। ইলতুৎমিস সুলতান হওয়ার সময় অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সমস্যাগুলো, কুতুবুদ্দিনের পুত্র আরামশাহ, মুলতান ও বিহারের প্রশাসক ও রাজপুতদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলো। সমস্যাগুলিকে তিনি ধৈর্য্য ও শান্তভাবে মোকাবিলা করেন এবং সফল হন। এদের মধ্যে কয়েকজনকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। ফলে তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

ইলতুৎমিস

এছাড়া তাঁর রাজ্যশাসন কালে মহাপরাক্রমশালী মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল শাসক চেঙ্গিস খাঁ ভারত আক্রমণ করে। চেঙ্গিস খাঁ সিন্ধু নদীর তীরের অনেক অঞ্চল দখল করে নেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের বিচক্ষণ বুদ্ধির বলে চেঙ্গিস খাঁ অধিক অগ্রসর হতে পারেনি। এইভাবে বিভিন্ন সমস্যার সফলভাবে সমাধান করে দিল্লীর শাসন সুদৃঢ় করে রেখেছিলেন। এইসব কারণের জন্য তিনি ভারতে সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বলা হয়।

ইলতুৎমিস একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি টংকা নামক এক মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তাঁর সময়ে বিচার বিভাগের সংস্কার হওয়ার সাথে সাথে কলা, স্থাপত্য ও শিক্ষার অনেক উন্নতি হয়েছিলো। কুতুবুদ্দিনের আরম্ভ করা কুতুবমিনার নির্মাণকার্য্য তাঁর সময়ে শেষ হয়। ইলতুৎমিসের মৃত্যু ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়।

তুমি জানো কি?

- ইলতুৎমিসের পুরো নাম সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস।
- ছোট বেলায় তার ভাইয়েরা তাকে জামালউদ্দিন নামে বণিকের কাছে বিক্রী করে দেয়।
- পরে ইলতুৎমিস কুতুবুদ্দিনের কাছে ক্রীতদাস হয়ে আসে।
- ইলতুৎমিসের সময় দিল্লী দ্বিতীয় বাগদাদ রূপে বিবেচিত হতো।
- ইলতুৎমিস তাঁর রাজ্যকে কয়েকটি ইক্তারে ভাগ করেছিলেন।
- ইলতুৎমিস ৪০ জন দক্ষ ক্রীতদাসকে প্রশাসনিক তালিম দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে ছিলেন। এরা সব ৪০ সেনা বা চিহাল গানি নামে অভিহিত।

ইলতুৎমিস টংকা নামক মুদ্রা প্রচলন করার ফলে লোকেদের কি কি সুবিধা হয়ে থাকবে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

রাজিয়া সুলতান (১২৩৬-১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ)

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শাসন কার্য্যে তুর্কী সামন্তদের সাহায্য পেলেও কয়েকজন প্রাদেশিক শাসক তাঁর বিরোধিতা করেছিলো। সেই জন্য শাসনকার্য্যে তিনি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর পরে কিছু দুর্বল সুলতানেরা শাসনকার্য্য ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেনি। যার ফলে ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদের মৃত্যুর পরে গিয়াসুদ্দিন বলবন দিল্লীর সুলতান হয়েছিলেন।

তুমি জানো কি ?

রাজিয়া সুলতান হচ্ছেন দিল্লী সিংহাসনে বসা প্রথম ও শেষ মুসলমান শাসিকা।

রাজিয়া সুলতানের মতো তোমার জানা আমাদের দেশের ও বিদেশের কয়েকজন শাসিকার নামের তালিকা করো।

গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

গিয়াসুদ্দিন বলবন্ সুলতান হওয়ার আগে ছিলেন ইলতুৎমিসের ৪০ জন ক্রীতদাসের একজন। সিংহাসনে আরোহণের পরে ইলতুৎমিস্ সুলতান পদের মর্য্যাদা, ক্ষমতা প্রভাব বাড়ানোর জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। বলবন্ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করলেন। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করলেন। তার সঙ্গে অতীব সক্রিয় এক গুপ্তচর সংস্থা গঠন করেছিলেন। কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে দিল্লী ও দোয়াবরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি শুধরে ছিলেন। বলবনের শক্তিশালী সৈন্যদল থাকায় তিনি মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে উত্তর ভারতকে রক্ষা করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দিন বলবন্

বলবন কেন শক্তিশালী গুপ্তচর সংস্থা গঠন করেছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

বলবন তাঁর সাম্রাজ্যের সুপরিচালনার জন্য শাসন ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। কলা ও সাহিত্যের বিকাশ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিলো। অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকেদের তাঁর দরবারে স্থান দিয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে আমীর খুস্রু অন্যতম।

তুমি জানো কি ?

- বলবন্ রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্গীয় রাজতন্ত্র নীতি (*Devine Right of Kingship*) অনুসরণ করতেন।
- সুলতান নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি মনে করতেন।
- সুলতানকে দর্শন করতে হলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বা পদচুম্বন করতে হতো।
- রক্ত ও লোহা নীতি (কঠোর) অবলম্বন করে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলেন।

বলবন অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এইসব কাজের জন্য বলবন্ দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে পরিগণিত হন। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেই দাসবংশের পতন আরম্ভ হয়। দাস বংশের পরবর্তী শাসকরা দুর্বল ছিলেন। তাই এরপরে দিল্লীতে খিলজী বংশের শাসন আরম্ভ হয়।

জালালউদ্দিন খিলজী

বলবন সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

খিলজী বংশ (১২৯০-১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ):

১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দিন খিলজী দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জামাতা আলাউদ্দিন খিলজী সিংহাসনে বসেন।

আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬)

আলাউদ্দিন খিলজী ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং ১৩১৬ পর্য্যন্ত ২০ বছর রাজ্য শাসন করেন। সুলতানী ইতিহাসে আলাউদ্দিনের স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। তিনি দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হয়ে সমগ্র পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পরিষদ আল্লা-উল-মুলকের পরামর্শে তিনি প্রথমে ভারত জয় করতে নিষ্পত্তি নিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিন খিলজী

মনে করো যদি তুমি তখন আলাউদ্দিন খিলজী হতে, তাহলে পৃথিবী জয় করার জন্য কি যোজনা করতে ভেবে উল্লেখ করো।

এছাড়া তিনটি কাজের জন্য তিনি দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। সেগুলো হলো তুর্কী সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস, দক্ষিণাত্য ও রাজস্থান বিজয় এবং মঙ্গোল শক্তির ধ্বংস সাধন।

এই ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁর বিরাট এক সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিলো। সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্য তিনি গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দোআব অঞ্চলের ধনী লোকেদের ওপর বেশী বেশী কর বসিয়েছিলেন। এছাড়া জমি মাপ জোক করে সেই অনুসারে কর বসানো হয়েছিলো। এইভাবে আলাউদ্দিন বিভিন্ন সূত্র থেকে কর আদায় করে রাজকোষ বৃদ্ধি করেছিলেন। জিনিসপত্রের দরদাম নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিলো।

তুমি জানো কি?

- ❖ আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন জালালউদ্দিনের ভাইপো।
- ❖ আলাউদ্দিন বলতেন সুলতান পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তিনি জনতার সঙ্গে তুলনীয় নন।
- ❖ তাঁর কথাই আইন। এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যা করবেন তাই ঠিক।

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন উলখুখাঁও নসরত খাঁয়ের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীকে গুজরাটের রাজধানী অনহিলওয়াড়া আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেন। এই সেনা বাহিনী গুজরাট ও মালব জয় করেছিলেন। এর পরে আলাউদ্দিন রাজস্থানের রণথম্বর ও মেওয়ারের চিতোর দুর্গ অধিকার করেছিলেন। তিনি মেওয়ারের রানী পদ্মিনীকে পাওয়ার জন্য মেওয়ার আক্রমণ করেন কিন্তু পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত রমণীগণ জহর ব্রত পালন করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এছাড়া আলাউদ্দিন সিওয়ানা ও জালোর প্রভৃতি রাজ্য জয় করেছিলেন।

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য

উত্তর ভারতে অনেকগুলি রাজ্য জয় করার পরে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুরের সেনাপতিত্বে আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য জয় করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। মালিক কাফুর দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি, তেলেঙ্গানা, দ্বার সমুদ্র, পাণ্ড্য ও হয়শাল প্রভৃতি রাজ্য জয় করে প্রচুর টাকা ও সোনা নিয়ে এসেছিলেন। এইসব রাজ্যের রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যের শাসক হতে সুলতান অনুমতি দিলেন। এর বদলে তাঁরা সুলতানকে নিয়মিত কর দিতেন। এইভাবে আলাউদ্দিন খিলজী এক বিরাট সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হয়েছিলেন।

মানচিত্র দেখে আলাউদ্দিনের রাজ্যের নাম লেখো।

সাম্রাজ্য ও রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে, সাম্রাজ্যের আয়তন বড় ও রাজ্যের আয়তন ছোট।

সেইভাবে অন্য প্রভেদগুলি লেখো।

খিলজী বংশের শেষ সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহকে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হয়েছিলো। তাঁর পরে নাসিরউদ্দিন খুস্রু শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁকে তুর্কী আফগান সামন্তরা হত্যা করেন।

তুমি জানো কি?

- ❖ আলাউদ্দিন ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় তাঁকে ইসলামের ধর্মের রক্ষক পদবী দেওয়া হয়েছিলো।
- ❖ তিনি হিন্দুদের প্রতি নির্দয় ছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে জিজিয়া, আবগারী, আমদানী ও রপ্তানী কর আদায় করতেন।

তাঁর জায়গায় খাজি মালিক গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নতুন সুলতান হয়ে তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক (১৩২৫-১৩৪১)

গিয়াসুদ্দিনের এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরে তার পুত্র কুনা খাঁ মহম্মদ-বিন-তুঘলক্ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট ২৬ বছর শাসনকার্য্য চালিয়েছিলেন। তাঁর অদ্ভুত মেজাজ চরিত্র ও অভিনব কার্য্যকলাপের জন্য সুলতানদের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর শাসন বিষয়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা আরব পর্য্যটক ইবন বতুতা এক বিবরণী লিখে গেছেন। এই বিবরণীতে তখনকার ভারতের অবস্থা স্থান পেয়েছে।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক

ইবন বতুতার মতো অন্য কোন বিদেশী পর্য্যটক ভারতে এসেছিলেন আলোচনা করে লেখো।

মহম্মদ আদর্শবাদী রাজা ছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র, দর্শন, গণিত ও ধর্ম শাস্ত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি দানশীল, সরল ও নিরাড়ম্বর ব্যক্তি ছিলেন। মহম্মদ তাঁর সাম্রাজ্য ও জনসাধারণের উন্নতির জন্যে অনেক যোজনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্বল মনোভাবের জন্য কোনো কাজ শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে পারতেন না। তাঁর একাগ্রতা, দূরদৃষ্টি ও ধৈর্য্যের অভাবের জন্য তাঁর যোজনাগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারতো না। এই জন্যে লোকে তাঁকে আধপাগলা সম্রাট বলতো। মহম্মদের বিভিন্ন যোজনার কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি (১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে)

মহম্মদ বিন তুঘলক ভারত ও এশিয়ার কয়েকটি রাজ্য জয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন এবং সেই সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্যে অর্থের প্রয়োজনে তিনি গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে চাষীদের কাছ থকে অধিক কর আদায় করার আদেশ দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সে বছর বৃষ্টি ভালো না হওয়ায় ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং চাষীরা বর্ধিত কর দিতে অক্ষম হয়। মহম্মদ চাষীদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায়ের হুকুম দেয়। সেই কর্ম করার জন্যে সুলতানের কর্মচারীরা লোকেদের ওপর বল প্রয়োগ করার ফলে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে লোকেরা জঙ্গলে পলায়ন করতে লাগলো। কিছু লোককে কর্মচারীরা তাড়া করে হত্যা করেন। এইসব কারণে উর্বর দোয়াব অঞ্চলে ফসল না হয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। মহম্মদ নিজের ভুল বুঝতে পেরে লোকেদের কর মাফ করেছিলেন। লোকেদের চাষের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। জলের জন্য কুঁয়ো খুঁড়ে দিতে বললেন, পুকুর কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব পদক্ষেপ নিতে দেরী হওয়ায় তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

তুমি জানো কি?

রাজা সৈন্য ছাড়া টিকতে পারে না। মাইনে না পেলে সৈন্যরা বাঁচবে না। তাই তাদের খরচের জন্যে চাষীদের কাছ থেকে ভু-রাজস্ব আদায় করা হয়। কৃষকেরা সচ্ছল ও খুশীতে থাকলে ভু-রাজস্ব আনন্দের সহিত দেয়।

- ভুরাজস্বের মতো জনসাধারণের কাছ থেকে সরকার আর কি কি কর আদায় করেন লেখো।
- তুমি যদি তুঘলকের সময়ে তাঁর প্রজা হতে এবং তাঁর লোকেরা অধিক কর দিতে তোমায় বাধ্য করা হতো, তুমি তাদের সঙ্গে কিভাবে কথাবার্তা বলতে?

রাজধানী পরিবর্তন (১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ):

মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মহম্মদ রাজধানী দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত করে দৌলতবাদ (এখন ঔরঙ্গাবাদ) নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কার্য্য সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি।

তুমি জানো কি?

- মহম্মদ দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ রাজধানী পরিবর্তন করার আগে রাস্তার পাশে সরাইখানা ও ডাকচৌকি নির্মাণ করিয়েছিলেন।
- ইবন বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, দিল্লীতে একজন অন্ধ ও এক খোঁড়া লোককে দেখে, খোঁড়া লোকটিতে ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে দৌলতাবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন।

লোকেদের দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ যাওয়ার দৃশ্য

মহম্মদ দরবার ও রাজ কর্মচারীদের না নিয়ে কেবল দিল্লীর সব অধিবাসীদের দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ প্রায় ১৫০০ কিমি. দূরে থাকার ফলে রাস্তায় অনেক লোকের প্রাণ গেলো। এ ছাড়া দৌলতাবাদের পরিবেশ, জলবায়ু ও খাদ্য তাঁদের পক্ষে অনুকূল না হওয়ার জন্যেও অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া উত্তর ভারত থেকে বহুদূরে হওয়ায় এই অঞ্চলের ওপর মহম্মদের নিয়ন্ত্রণ থাকলো না। ফলে এক বছর পরেই তিনি রাজধানী পুনরায় দিল্লীতে স্থানান্তরিত করলেন। এইসব কাজ তাঁর দুর্বল মনের পরিচয় বহন করে। ফলে দক্ষিণ ভারতে বাহমনী ও বিজয় নগর রাজ্য নিজের শক্তির প্রভাব বিস্তার শুরু করে। এদের দমন করার উপযুক্ত পদক্ষেপ সুলতান নিতে পারেননি।

তুমি জানো কি ?

মহম্মদ প্রথমে (২০০ রতির) দিনার নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পরে আদালি নামে ১৪০ রতির রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

মহম্মদের রাজধানী পরিবর্তন কতটা যুক্তিযুক্ত ছিলো, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

তাম্রমুদ্রার প্রচলন (১৩২৯-১৩৩০):

মহম্মদের আরও একটি যোজনা সফলভাবে কার্য্যকরী হতে পারেনি। তাঁর শূন্য রাজকোষ পূরণ করার জন্য তিনি তামার মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এগুলো দিয়ে লোকেরা রাজকোষ থেকে সোনা ও রুপোর টাকা বদলে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এর সুযোগ নিয়ে লোকেরা তামার টাকা তৈরী করে রাজকোষ থেকে সোনা রুপোর টাকা নিয়ে চলে গেলো। ফলে রাজকোষ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা রুপো খালি হয়ে তামার টাকা ভর্তি হয়ে গেলো। ফলে রাজ্য দরিদ্র অবস্থায় পৌঁছে গেল, রাজ্যের বাণিজ্য কারবার

প্রায় অচল হয়ে পড়লো। দেশকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য অবশেষে সুলতান এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

মহম্মদ সুলতানের তাম্রমুদ্রার প্রচলন কতদূর যুক্তিযুক্ত ছিলো, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

তুমি জানো কি?

সুলতানী শাসনের অন্য মন্ত্রীরা হলেন সদর-উস্-সদর ধর্ম বিভাগ মন্ত্রী, মজলিস-ই-খালওয়াজ সুলতানের পরামর্শদাতা।

বারিক-ই-মামলিক গুপ্তচর মন্ত্রী, দিওয়ান-ই-আমীর কোহি কৃষিমন্ত্রী।

লোকেদের অনেকরকম উন্নতির জন্য মহম্মদ বহু প্রকার শাসন নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টির অভাব হেতু কোনো কিছুই সফলভাবে কার্য্যকরী হয়ে ওঠেনি। সেই কারণে তিনি প্রজা, সামন্ত, উলেমা (ধর্মগুরু)দের সহযোগ লাভ করতে পারেননি। তাই ইতিহাসে তিনি একজন বিফল শাসকরূপে পরিচিত।

সফল শাসক হওয়ার জন্যে একজন রাজার কাছে কি কি গুণ থাকা দরকার, অন্যাদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

তুঘলক বংশের পরে ভারতে সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশ শাসন করতেন। লোদী বংশের রাজাদের ওপরে আফগানেরা সন্তুষ্ট না থাকার কারণে এঁরা কাবুলের রাজা বাবরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী শাসন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে দিল্লীর সিংহাসনে মোগলদের আরোহণ শুরু হলো।

সুলতান যুগের শাসন পদ্ধতি:

সুলতান যুগের শাসন পদ্ধতি ভারতে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলো। আলাউদ্দিন খিলজী ও ইব্রাহিম লোদীর এবং মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মতো সুলতানেরা রাজ্যের সুপরিচালনার অনেক শাসননীতি প্রণয়ন করেছিলেন। এই শাসননীতি তিনটি স্তরে কার্য্যকারী হতো। সেগুলি হলো: ১. কেন্দ্রীয় শাসন, ২. প্রাদেশিক শাসন, ৩. স্থানীয় শাসন।

আমাদের দেশের শাসন কোন কোন স্তরে হচ্ছে সেগুলি লেখো।

কেন্দ্রীয় শাসন:

সুলতান কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান ছিলেন। তিনি শাসন বিভাগ ও সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন। তাঁকে শাসনকার্য্যে সাহায্য করার জন্যে তিনি অনেক মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন। এই মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে উজির বলা হতো।

তুমি জানো কি?

জিজিয়া কর— অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হতো।

জাকাত— ধর্মীয় কর মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হতো।

উসর— মুসলমানদের জলসেচনের জমির ওপর কর বসানো হয়েছিলো।

খামস্—রাজ্যজয় দ্বারা লুণ্ঠিত ধনের কিঞ্চিৎ অংশ রাজকোষে রাখা হতো।

খরজ্—শস্য কর।

উজির সামরিক ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। কাজি বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। দিওয়ান-ই-ইনখা চিঠিপত্রের দায়িত্বে থাকতেন। বারিদ-এ-মামলিক খবর সরবরাহের প্রধান ছিলেন। বক্সি সৈন্য বিভাগের মাইনে পত্তরের কথা বুঝতেন। এ ছাড়া রাজ পরিবার, কৃষি ও নির্মাণ বিভাগ ইত্যাদিতে অনেক কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলো।

সুলতান কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান হওয়াতে লোকেদের কি কি সুবিধা ও অসুবিধা হতো, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

রাজ্যের প্রধান আয় ভূরাজস্ব থেকে আমদানি হতো। উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ কর হিসেবে আদায় করা হতো। দিল্লীর সুলতানেরা খামস্, খরজ, জাকাত, জিজিয়া এবং উসর প্রভৃতি পাঁচ রকমের কর আদায় করতেন। সুলতানেরা কৃষির উন্নতির জন্যে কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাজার দর ও বিভিন্ন দ্রব্যের মাপ ও ওজন, আইন করে নিয়ন্ত্রিত হতো। কালোবাজারী ও বেআইনী মজুতকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে অনেক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছিলো।

তোমার অঞ্চলে ওজন ও মাপে ঠকানো রোধে, সরকারের তরফে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া আছে, তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

প্রাদেশিক শাসন:

রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো। প্রাদেশিক স্তরে সুশাসন পরিচালনার জন্যে মুফতি, ওয়ালি ও নায়েব সুলতান প্রভৃতি শাসনকর্তাগণ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা কেন্দ্রের সুলতানের মতো সমস্ত সুযোগ ও ক্ষমতার উপভোগী ছিলেন। প্রদেশের আয় ব্যয় দিওয়ান-ই- ওয়াজিরত হিসেবনিকেশ ও পরীক্ষা করতেন। প্রদেশে নিযুক্ত শাসনকর্তারা প্রাদেশিক স্তরে বিভিন্ননীতি নিয়ম কার্য্যকারী করতেন।

স্থানীয় শাসন:

প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সিক্ ও প্রত্যেক সিক্‌কে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করা হয়েছিলো। এদের শাসনকার্য্য একজন আমিল দেখতেন। মকদ্দম, পাটওয়ারী ও মুশরিফ্ প্রভৃতি স্থানীয় কর্মচারী খাজনা আদায় করতেন। মুশরিফ খাজনা আদায়কালীন উপস্থিত থেকে হিসাবপত্র দেখাশুনা করতেন। পাটওয়ারী দলিল ও কাগজপত্রের হিসেব দেখতেন। শাসনের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে গ্রাম। গ্রামের লোকেরা মিলিত হয়ে পঞ্চায়েত গঠন করতেন। পঞ্চায়েত গ্রামের, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার স্বচ্ছতা প্রভৃতি ওপর নজর রাখতো। চৌকিদার গ্রামের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখতো।

তুমি জানো কি?

- সুলতানী শাসনে প্রত্যেক পরগণা ১০০ কিম্বা ৮৪টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো।
- গ্রামের মুখিয়াকে মকদ্দম বলা হতো।

- সুলতানদের স্থানীয় শাসনের মতো তোমার অঞ্চলের শাসন কিভাবে চলছে। অন্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।
- তোমাদের অঞ্চলে লোকেদের থেকে সরকার কি কি কর কেন আদায় করছে অন্যদের কাছ থেকে জেনে লেখো।

এইভাবে সুলতানরা বিভিন্ন নীতি নিয়ম প্রণয়ন করে সুচারুরূপে তাঁদের শাসনকার্য্য চালাতেন। এর ফলে সারাদেশে শান্তি শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিলো।

সুলতানদের কলা ও স্থাপত্য:

একটি পুরাতন মুসলিম স্থাপত্য

তুর্কী আফগানরা ভারতে তাদের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার কলা ও স্থাপত্যের নতুন শৈলী এবং কারিগরী কৌশল এনেছিলেন। এই নির্মাণ কৌশল ব্যবহার করে তাঁরা ভারতে অনেক মসজিদ, সমাধি, মন্দির দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদের নির্মাণের জন্য ভারতে যথেষ্ট আরবী শিল্পী পাওয়া গেল না। ফলে সুলতানেরা বিভিন্ন নির্মাণকার্য্যের জন্য দক্ষ ভারতীয় শিল্পীদের ওপর নির্ভর করলেন। এর দ্বারা ভারতীয় কলা ও স্থাপত্যের সঙ্গে ইসলামী শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটে এক নতুন শিল্পকলা জন্ম নিলো। একে ইন্দো ইসলামিক কলা ও স্থাপত্য বলা হয়। ভারতীয় স্থাপত্যে চাপ ও গম্বুজের ব্যবহার এই সময় দেখা যায়। গম্বুজের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার করার জন্যে উঁচুদরের গাণিতিক জ্ঞান ও যান্ত্রিক বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছিলো।

কুতুবমিনার

মীনার তৈরী করার জন্যে পাথরের ওপর পাথর লম্বালম্বি ও তির্যকভাবে রাখা হতো। ভারতীয়দের স্থাপত্য শৈলী, দিল্লীর সুলতানদের আকৃষ্ট করেছিলো। এদের মধ্যে প্রথমে কুতুবুদ্দিন আইবেক্ দিল্লীতে প্রসিদ্ধ কুওয়াত্-উল-ইসলাম ও ঢাই দিনকা ঝোপড়ী নামে দুটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি কুতুবমিনার নির্মাণকার্য্য শুরু করেন। এই মিনারের কাজ ইলতুৎমিস সম্পূর্ণ করে ইসলামী স্থাপত্যের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করেছিলেন।

দিল্লীর সুলতানেরা আমোদ-প্রমোদের জীবন যাপন করতেন বলে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহার নির্মিত ফিরোজ শাহ কোটলা এক সুন্দর নমুনা।

ইলতুৎমিস তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের সমাধি হিন্দু স্থাপত্য শৈলীতে নির্মাণ করিয়েছিলেন। বলবন দিল্লীতে লোহিত প্রাসাদ ইসলামী শৈলীতে তৈরী করিয়েছিলেন। বলবনের সমাধি সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শৈলীতে নির্মিত হয়েছিলো। এই সমাধির গোলাকৃতি খিলানের পথ তুর্কী স্থাপত্যের এক নিদর্শন।

খিলজীর রাজত্বকালে তুর্ক ও আফগান স্থাপত্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিলো। এই সময় নির্মিত জমাহত্‌খানা মসজিদ ও আল্লা-ই-দরওয়াজা মুখ্য। সৈয়দ ও লোদী বংশের শাসকদের স্থাপত্য কীর্তি হচ্ছে মৌত-কি-মসজিদ। সামন্তদের কবরগুলোর মধ্যে বড়ে খাঁ ও ছোটে খাঁয়ের কবর তৈরীতে উন্নত স্থাপত্য কলা দেখা যায়।

তুমি জানো কি?

- খিলজী রাজত্বের সময় জমাহত্‌ খানা মসজিদ ও হদার সাতুন রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিলো।
- শিরি নামক স্থানে খিলজী একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।
- গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লীর কাছে তুঘলকাবাদ শহর বসিয়েছিলেন।
- সুলতান আহম্মদ শাহ ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদাবাদ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রাদেশিক শাসকগণ নিজেদের রাজধানীতে অনেক প্রাসাদ ও সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। এদের মধ্যে গুজরাটে অহম্মদশাহের তৈরি আহমদাবাদ শহর ও মালাবারের মাণ্ডুতে জামি মসজিদ, হাজাজ মহল অন্যতম। জৌনপুরের অতলদেবী মসজিদ, লাল দরওয়াজা এই সময়ের এক একটা উৎকৃষ্ট কলাকৃতি। এছাড়া কাশ্মীরের কারিগরেরা মধ্য এশিয়ার শৈলীতে তখন অনেক সুন্দর সুন্দর কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

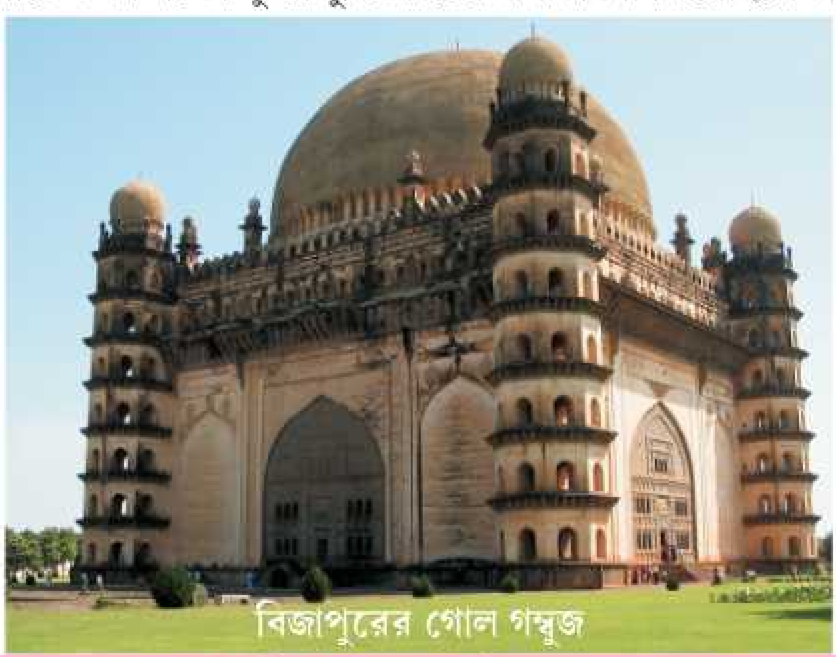

বিজাপুরের গোল গম্বুজ

তোমার অঞ্চলে থাকা প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য কলা স্থাপত্যের নাম লেখো।

দাক্ষিণাত্যে বাহমনী শাসকেরা নিজের রাজধানী গুলবর্গা ও বিদরে, দিল্লীর সুলতানদের অনুকরণে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। গুলবর্গার জামা মসজিদ, দৌলতাবাদের চান্দ মিনার, এবং বিদরে মহম্মদ গওয়ানের মাদ্রাসা উন্নত স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে।

প্রাদেশিক রাজ্যগুলির উত্থান:

দিল্লীতে সুলতানী শাসন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়লো। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিল্লী সুলতানের অধীনে থাকা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রাদেশিক রাজা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে আলাদা হয়ে গেলো। এছাড়া কিছু রাজপুত রাজ্য ও গুজরাটের কিছু প্রদেশ তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। আরও মালব, বঙ্গ কাশ্মীর ইত্যাদি প্রদেশে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য গড়ে উঠলো। এছাড়া মহম্মদ-বিন্- তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে তাঁর কর্তৃত্ব কমে যাওয়ায় অনেক রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়ালো। এদের মধ্যে বাহমনী ও বিজয়নগর অন্যতম।

সুলতানী শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন কোন রাজ্য স্বাধীন হয়েছিলো তার এক তালিকা করো।

বাহমনী রাজ্য:

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন সামন্ত সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দৌলতাবাদ দখল করেছিলেন। তাঁরা তাদের মধ্যে থেকে নাসিরুদ্দিন শাহকে রাজা করেছিলেন। তিনি রাজ্য চালাতে অপারগ হওয়ায় রাজপদ পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপরে সামন্তগণ হাসান গাঙ্গুকে রাজা করতে নিষ্পত্তি নিয়েছিলেন। হাসান গাঙ্গু ১৩ই আগস্ট ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্য গঠন করেছিলেন। গুলবর্গা এই রাজ্যের রাজধানী হয়েছিলো। পরে হাসান গাঙ্গু বাহমন শাহ উপাধি ধারণ করে বাহমনী রাজ্য শাসন করতেন।

তুমি জানো কি?

- বাহমনী রাজ্য ১৮০ বছর টিকে ছিলো।
- হাসান গাঙ্গু পার্সিয়া রাজা বাহমনের বংশধর বলে বলা হয়।
- হাসান গাঙ্গু আবুল মুজফর আলাউদ্দিন বাহমনশাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন।

হাসান গাঙ্গু একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কালক্রমে তাঁর রাজ্যে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সমস্ত উত্তর ভাগ মিশে গেছিলো। তিনি তাঁর রাজ্যের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেক ভাগে একজন করে প্রশাসক রেখেছিলেন। বাহমনী রাজ্যে ১৮ জন রাজা ১৮০ বছর রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় আহম্মদ শাহ শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর দ্বারা অনেক মসজিদ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হয়েছিলো।তাঁর সময়ে

লোকে শান্তিতে বসবাস করতেন। মামুদ শাহ বাহমনী রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাহমনী রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে, বেরার, বিদর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিজাপুর নামে ৫টি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো।

- হাসান গাঙ্গু তাঁর রাজ্যকে চার ভাগে ভাগ করে দেওয়ার কারণ কি হতে পারে, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।
- আর কোন কোন কারণে দক্ষিণ ভারতে ৫টি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠলো, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

তুমি জানো কি?

বাহমনী রাজ্যের পতন হওয়ার পরে সেখানকার ৫টি স্বাধীন রাজ্যের রাজাদের নাম হচ্ছে:

বেরার—ইমদাদ্ শাহ।

আহম্মদনগর—নিজাম আহম্মদ শাহ।

গোলকুণ্ডা—কুতুব শাহ।

বিজাপুর—আদিল শাহ।

বিজর—বারিদ্ শাহ।

বিজয়নগর রাজ্য:

বিজয়নগর রাজ্য বাহমনী রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হরিহর ও বুকা নামে দুই ভাই হয়শাল রাজ্য (আধুনিক মহীশূর) জয় করে এই রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। হস্তিনাবতী বা এখনকার হাম্পী তাঁদের রাজ্যের রাজধানী ছিলো। বিজয়নগর রাজ্যকে মোট ১৬ জন রাজা (১৩৩৬-১৫৬৫) ২৩০ বছর শাসন করেছিলেন। এই সময় কালের মধ্যে বিভিন্ন রাজবংশ বিজয়নগর রাজ্যকে শাসন করেছিলেন। প্রথমে হরিহর ১৩৩৬-১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দ ও বুকা ১৩৫৬-১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন করেন। পরে এই রাজ্য সঙ্গম বংশ, সালুভ ও তুলুভ বংশের দ্বারা শাসিত হয়েছিলো।

হরিহর ও বুকা

বিজয়নগরের রাজারা বিদ্বানদের প্রোৎসাহিত করতেন। তাঁরা তেলেগু ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। কাষ্ঠ কারুকার্য্য ও হস্তিদন্তের কারুকার্য্য সেই সময়ে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল।

তুমি জানো কি?

তিনটে কারণে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য পরস্পরের শত্রু ছিলো। তা হলো—

১. রায়চুরকে নিজের অধীনে রাখা।

২. গোলকুণ্ডায় প্রচুর হীরে পাওয়া যায় বলে একে নিজের অধীনে রাখা।

৩. উভয় রাজ্যের রাজাদের রাজ্য জয়ের প্রবল আগ্রহ।

বিজয়নগরের রাজারা অনেক মন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এই কীর্তিগুলির মধ্যে হজরা ও বিঠাল স্বামী মন্দির অন্যতম। বিজয়নগর রাজ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলো। বিজয়নগর রাজ্যের লোকেরা বর্মা, চীন, আরব ও ইউরোপ মহাদেশের লোকেদের সঙ্গে বাণিজ্য কারবার করতেন।

বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। এমনকী বাহমনী রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পরেও তারা পরস্পরের বন্ধু হতে পারেনি। এর কারণ উভয় রাজ্য কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যে থাকা বাইচুরকে অত্যধিক উর্বর অঞ্চল বলে নিজ অধীনে রাখতে চেষ্টা করতো। উভয় পক্ষই যুদ্ধের সময় তোপ ব্যবহার করতো। যুদ্ধে বন্দুক ব্যবহারের জন্য বিজয়নগরের শাসকগণ ইউরোপীয়দের নিযুক্ত করতেন, আর বাহমনী শাসকরা তুর্কীর ভাড়াটে সৈন্যদের নিযুক্ত করতেন।

বাহমনী ও বিজয়নগরের শাসকগণ রায়চুরকে কেন নিজের অধীনে রাখতে চাইতেন, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

তুলুভ বংশের রাজা কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরের খ্যাতি বেড়ে গিয়েছিলো। শত্রুদের প্রতি তিনি অতি নির্দয় ছিলেন না। সর্ব ধর্মের লোকেদের তিনি সমান চক্ষে দেখতেন।

বিজয়নগরের রাজা রামরায়ের শাসনের কালে বাহমনী রাজ্যের সব মুসলমান শক্তি মিলিত হয়ে ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক যুদ্ধে ডালিকোটা নামক জায়গায় বিজয়নগরের রাজা রাম রায়কে পরাস্ত করছিলো। তার ফলে বিজয়নগরের পতন হয়। পরবর্তীকালে সুলতানেরা মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো।

তুমি জানো কি ?

- বীর নরসিংহ তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- ওড়িশার গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব কৃষ্ণদেবের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন।

আমরা কি শিখলাম:

- ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫টি রাজবংশ দিল্লীতে সুলতানী শাসন চালিয়েছিলো।
- কুতুবুদ্দিন আইবক দিল্লীতে দাসবংশের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছিলো।
- কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য্য কুতুবুদ্দিন আইবক আরম্ভ করেন।
- কুতুবুদ্দিন আইবকের পরে ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

- রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসা প্রথম ও শেষ মুসলমান শাসিকা ছিলেন।
- গিয়াসুদ্দিন বলবন সুলতান পদবীর মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়িয়েছিলেন।
- খিলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্য জয় করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।
- মহম্মদ-বিন-তুঘলক নিজের সাম্রাজ্যর উন্নতির জন্যে অনেকগুলি অভিনব যোজনা প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু, সঠিকভাবে কার্য্যকারী করতে পারেননি।
- সুলতানী শাসন প্রণালী ত্রিস্তরীয় ছিলো।
- সুলতানদের শাসনকালে কলা ও স্থাপত্যের উন্নতি চরম সীমায় পৌঁছেছিলো।
- দক্ষিণ ভারতের প্রাদেশিক রাজ্যের মধ্যে বাহমনী ও বিজয়নগর প্রধান ছিলো।

প্রশ্নাবলী

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(ক) দিল্লীতে তুর্কী সুলতানেরা কত বছর শাসন করেছিলেন ?

(খ) কুতুবুদ্দিন প্রতিষ্ঠা করা বংশকে দাস বংশ কেন বলা হয় ?

(গ) ইলতুৎমিস বিভিন্ন সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করেছিলেন ?

(ঘ) রাজিয়া সুলতান অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণ কি ?

(ঙ) গিয়াসুদ্দিন বলবন সম্রাটের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ?

(চ) ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজীর স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে কেন ?

(ছ) মহম্মদ বিন্ তুঘলককে আধপাগলা (ছিটিয়াল) রাজা বলা হতো কেন ?

(জ) সুলতানী যুগের শাসন কিভাবে বিভিন্ন স্তরে কার্য্যকরী হতো ?

(ঝ) ইন্দো-ইসলামিক কলা ও স্থাপত্য কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো ?

(ঞ) হাসান গাঙ্গু কিভাবে বাহমনী রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন ?

(ট) কৃষ্ণদেব রায় কে ছিলেন ? তাঁর ব্যক্তিত্ব কেমন ছিলো ?

২. **ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো:**

(ক) দিল্লীতে তুর্কী সুলতানেরা ৫০০ বছর শাসন করেছিলেন।

(খ) রাজিয়া বলবনের কন্যা ছিলেন।

(গ) কবি আমীর খুস্রু ইলতুৎমিসের রাজদরবারের কবি ছিলেন।

(ঘ) আলাউদ্দিন খিলজী উল্লুখ খাঁয়ের সেনাপতিত্বে উত্তর ভারতের অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন।

(ঙ) কুতুবুদ্দিন আইবকের সময়ে চেঙ্গিস খাঁ ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

(চ) ইবন বতুতা ইউরোপের পর্যটক ছিলেন।

(ছ) মহম্মদ-বিন্-তুঘলক্ তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে বিজয়নগর তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

(জ) দিওয়ান-ইন-বনসা রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

(ঝ) ঢাই-দিনকা-ঝোপড়ী মসজিদ মহম্মদ বিন তুঘলক তৈরী করেছিলেন।

(ঞ) মহম্মদ শাহর দ্বারা আহমদাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো।

৩. **বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ / সংখ্যা বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো:**

(ক) ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে মোট ———— টি রাজবংশ শাসন করেছিলেন।

(৪, ৫, ৬, ৭)

(খ) কুতুবুদ্দিন আইবক ——— খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।
(১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬)

(গ) কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য্য ———— দ্বারা আরম্ভ হয়েছিলো।

(কুতুবুদ্দিন আইবক্, ইলতুৎমিস্, বলবন, রাজিয়া)

(ঘ) বলবনের ————খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়েছিলো।

(১২৮৪, ১২৮৫, ১২৮৬, ১২৮৭)

(ঙ) পদ্মিনী ———— রাজ্যের রানী ছিলেন।

(মেওয়ার, রণথম্বর, জালোর, জয়পুর)

(চ) মহম্মদ-বিন্-তুঘলক মোট ———— বছর শাসন করেছিলেন।

(২৬, ২৭, ২৮, ২৯)

(ছ) মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলক তাঁর রাজকোষ পূরণ করার জন্যে ———— মুদ্রা চালু করেছিলেন।

(সোনা, রুপো, তামা, কাঁসা)

(জ) সুলতানগণ উৎপন্ন শস্যের ———— কর হিসেবে নিতেন।

(এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ)

(ঝ) ফিরোজ শাহ কোটলা ———— দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো।

(কুতুবুদ্দিন, ফিরোজ শাহ, আহম্মদ শাহ, রাজিয়া)

(ঞ) বিজয়নগর রাজ্যকে মোট ———— জনশাসক শাসন করেছিলেন।

(১৩, ১৪, ১৫, ১৬)

৪. **সময়কাল অনুসারে সাজিয়ে লেখো।**

রাজিয়া, বলবন, কুতুবুদ্দিন, ইলতুৎমিস্‌, মহম্মদ-বিন-তুঘলক, আলাউদ্দিন খিলজী)

তোমার জন্য কাজ

দিল্লীতে শাসন করা বিভিন্ন সম্রাটদের ফটো চিত্র সংগ্রহ করে তাঁদের কৃতিত্বের বিষয়ে লেখো।

■ ❖ ■

তৃতীয় অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৭০৭)

মোগলদের ভারত আগমন:

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুঘলক বংশের পতনের পরে সুলতানী শাসন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। সামন্ত ও প্রাদেশিক শাসকগণ সুলতানদের খাতির না করে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো। ফলে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। তখন দিল্লীতে লোদী বংশের রাজা ইব্রাহিম লোদী রাজত্ব করতেন। তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসনে আফগান আমীরগণ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন। তাঁকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার জন্যে তারা আফগান কাবুলের রাজা বাবরের সাহায্য চাইলেন। ঠিক সেই সময়েই বাবর ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করছিলেন। তিনি আফগান আমীরদের অনুরোধে ভারত অক্রমণ করলেন। দীর্ঘ দুইশত বৎসর ধরে মোগলরা ভারত শাসন করেছেন। বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে দেশকে যে ভাষণ দেন, তা মোগল সম্রাটদের বাসভবন ছিলো।

তুমি জানো কি ?

মোগল বংশের নাম 'মোঙ্গল' শব্দ থেকে এসেছে। এই বংশ ভারতকে দীর্ঘদিন ধরে শাসন করেছিলো।

লালকেল্লা

বাবর (১৫২৬-১৫৩০):

বাবর তৈমুরলঙ্গের বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো ওমরশেখ মির্জা। তিনি তুর্কীস্তানের অন্তর্গত ফরগনার রাজা ছিলেন। বাবর নিজে খুব সাহসী, বীর ছিলেন ও সৈন্য পরিচালনায় খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কাবুল ও কান্দাহার জয় করেছিলেন। তার পরে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথ নামক স্থানে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে প্রথম পানিপথ যুদ্ধ বলা হয়। বাবর এই যুদ্ধে জয় লাভ করার পরে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে ভারতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বাবর

বাবর ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রানা সংগকে খানওয়া যুদ্ধে পরাস্ত করেন। যা খানওয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত। এরপরে তিনি মেদিনী রাওকে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাস্ত করে চান্দেরী দুর্গ অধিকার করেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে নুসরত্ ও মাহমুদকে ঘর্ঘরা নদীর কূলে পরাস্ত করেন। এই ঘটনা ঘর্ঘরা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ বাবরের জীবনের শেষ যুদ্ধ। শেষে বাবর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বাবরের মৃত্যুর সময় তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো।

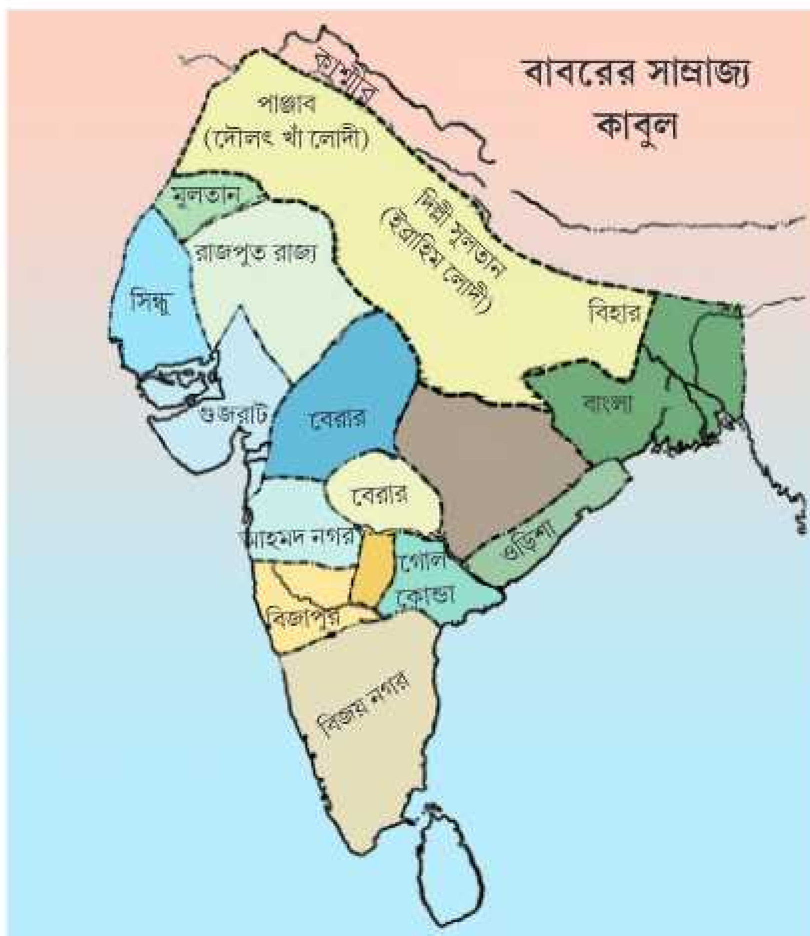

বাবর শুধু একজন যোদ্ধাই ছিলেন না। তুর্কী ভাষায় তিনি যে আত্মজীবনী লিখেছিলেন তাই 'বাবরনামা' নামে প্রসিদ্ধ।

নিম্নে দেওয়া ভারতের মানচিত্রে পানিপথ, খানওয়া ও ঘর্ঘরাকে চিহ্নিত করো।

তুমি জানো কি?

পানিপথ: দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্রর দিকে যেতে গেলে পানিপথ পড়ে।

খানওয়া: আগ্রা থেকে প্রায় ৩২ কিমি. দূরে ফতেপুরের কাছে খানওয়া নামক স্থান আছে।

হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬):

হুমায়ুন

বাবরের মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় না থাকার কারণে এর সুরক্ষার জন্যে হুমায়ুনকে সংঘর্ষ করতে হয়েছিলো। হুমায়ুনের রাজ্যশাসনের প্রারম্ভে আফগানেরা পুনরায় দিল্লীর ওপর নজর দিলো। এই সময়েই হুমায়ুনের ভাইয়েরা সিংহাসনের জন্য চক্রান্ত শুরু করে দিলো। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদাধিকারীও এই চক্রান্তে সামিল হয়েছিলেন। নতুন করে গঠন করা সেনাবাহিনীও দৃঢ় ছিলো না। এই ভাবে চারিদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে এলো। নিজের সাহস ও দক্ষতার অভাবের জন্য হুমায়ুনের পক্ষে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব হলো না। পরিণামস্বরূপ তাঁকে নিজের রাজ্য হারাতে হলো।

চিন্তা করো

হুমায়ুনের জায়গায় নিজেকে রাখো, এই পরিস্থিতিতে তুমি সাম্রাজ্য কিভাবে রক্ষা করতে?

শেরশাহের সঙ্গে সংঘর্ষ

শেরশাহ

হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে পারস্ত করে গুজরাট ও মালব অধিকার করেছিলেন। পশ্চিমে বাহাদুর শাহের মতো পূর্বে শের খাঁ পরাক্রমী আফগান বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর হুমায়ুন শের খাঁয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন এবং শের খাঁ আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

পরে যখন হুমায়ুন বাহাদুর শাহর সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন, শের খাঁ পুনরায় বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। সেই সময় বঙ্গের রাজা সুলতান মাহমুদ শাহ বহুত অর্থ দিয়ে শের খাঁয়ের

সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। এর ফলে শের খাঁয়ের প্রভাব সমগ্র বিহার ও বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন গুজরাট থেকে ফিরে শের খাঁয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চুনার দুর্গ অধিকার করেছিলেন। এর পরে তিনি বঙ্গ যাত্রা করে গৌড় অধিকার করেন। শের খাঁ নারা, বেনারস ও জৌনপুর অধিকার করে নিলেন। কোশি ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল শের খাঁয়ের অধীনে এলো। এই কথা শুনে হুমায়ুন আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করার সময় শের খাঁ রাস্তা অবরোধ করলেন। চৌসা নামক স্থানে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাস্ত হলেন। জীবন রক্ষার জন্য তিনি পুনরায় আগ্রায় ফিরে এলেন।

তুমি জানো কি?
হুমায়ুন শব্দের অর্থ হলো 'ভাগ্যহীন'।

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজে হুমায়ুন শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে দিল্লীর সিংহাসন হারালেন। তিনি সপরিবারে প্রথমে পাঞ্জাব ও পরে পারস্যে (ইরান) পলায়ন করলেন।

১৫৪০ থেকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শের শাহ ভারত শাসন করেছিলেন। শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন নিজ রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন। তিনি পারস্য রাজার সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করলেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব জয় করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করলেন, কিন্তু ফিরে পাওয়া সাম্রাজ্য তিনি এক বছরের বেশী ভোগ করতে পারলেন না। নিজের পাঠাগার থেকে নিচে নামার সময় পা পিছলে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলেন।

চিন্তা করো:
হুমায়ুন বিফল শাসকরূপে কোন কারণে ইতিহাসে নামিত আলোচনা করে লেখো।

মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার:

আকবরের সময় থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মধ্যযুগের ইতিহাসে এক উল্লেখনীয় সময়। এই সময় মোগলরা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে রাজনৈতিক একতা আনতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে সাহিত্য, কলা, কৃষি ও বাণিজ্যের বিকাশ হয়েছিলো। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতে এক নতুন সংস্কৃতির উত্থান হয়েছিলো।

আকবর

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫):

মোগল সম্রাটদের মধ্যে মহানুভব আকবর শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তাঁর পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবরের মাত্র ১০ বছর বয়স ছিলো। তখন তিনি পাঞ্জাবের শাসন দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে তিনি সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে বৈরাম খাঁ তাঁর অভিভাবকরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে হিমু মোগলদের পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নেন। তিনি শেরশাহ বংশের একজন রাজার সুযোগ্য মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁয়ের সাহায্যে হিমুকে দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করেন। তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে মোগল সাম্রাজ্যের স্থিতি সুদৃঢ় করেছিলেন।

চিন্তা করো:
তোমার মতে প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধের মধ্যে কোনটা মহত্ত্বপূর্ণ ও কেন?

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার:

আকবর একজন বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। তাই ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে তিনি, আজমীর, গোয়ালিয়ার, অযোধ্যা জৌনপুর, মালব ও গনওয়ানা প্রভৃতি রাজ্য জয় করে নেন। এর ফলে মোগল সাম্রাজ্য রাজপুত রাজ্যগুলির সীমা স্পর্শ করে নিলো। সেই সময় রাজপুতেরা অত্যন্ত সাহসী, যুদ্ধ প্রিয় এবং দেশভক্ত ছিলো। তাই আকবর হৃদয়ঙ্গম করলেন যে রাজপুতদের সাহায্য নিয়ে তিনি সাম্রাজ্যকে আরও সুদৃঢ় ও বিস্তার করতে পারবেন। তিনি তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

তিনি রাজপুত রমণীকে বিবাহ করেন এবং রাজা মান সিং আকবরের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মেওয়ারের রাজা রানাপ্রতাপ সিং আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি, তাই আকবর সেনাপতি মান সিংকে রানা প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করতে পাঠালেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদীঘাট যুদ্ধে মানসিংয়ের নেতৃত্বে মোগলরা রানা প্রতাপকে পরাজিত করে চিতোর দুর্গ অধিকার করেন।

প্রত্যেক সুবা কয়েকটি সরকার বা জেলায়, এবং প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিলো। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে পরগণা গঠিত হতো। সুবার মুখ্য শাসক ছিলেন সুবাদার। আকবর দুটি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করতেন একটি ভূ-রাজস্ব ও অন্যটি বাণিজ্য কর। রাজা তোডরমল তাঁর রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তোডরমলের বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিগুলোর মাপ করা হয়েছিলো। সাধারণত কৃষকেরা আয়ের এক তৃতীয়াংশ কর শস্য কিংবা মুদ্রার আকারে দিতো।

তোমার বাবা বর্তমান কি কি কর দিচ্ছেন বুঝে লেখো।

তুমি জানো কি ?

মনসব এক পদবী। এবং ব্যক্তিকে এই পদবী 'মনসবদার' ভাবে দেওয়া হতো। যার অধীনে শাসনকার্য্যের জন্য কিছু সৈন্য থাকতো।

সৈন্যবাহিনীকে অধিক শক্তিশালী করতে আকবর মনসবদারী প্রথা প্রচলন করেছিলেন। রাজকর্মচারী, সামন্ত ও সেনাপতিদের এই পদবী দেওয়া হতো। আকবর মনসবদারদের ৩৩ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মনসবদারদের অধীনে ৫ থেকে ১০ হাজার পর্য্যন্ত সৈন্য থাকতো।

চিন্তা করো:

যেমন আকবরের শাসনকালে দেওয়ান অর্থ বিভাগ, কাজী বিচার বিভাগের মুখ্য ছিলেন, বর্তমানে তোমার প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের মুখ্য কে আলোচনা করে লেখো।

আকবরের ধর্মনীতি:

আকবর তাঁর উদার ধর্মনীতির জন্যে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। আকবর হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া কর ও তীর্থযাত্রীকর তুলে নিয়েছিলেন। আকবর মাঝে মাঝে হিন্দুদের মতো বেশভুষা করতেন। হিন্দুদের পুজো পার্বণ ও উৎসবে যোগ দিতেন। অনেক হিন্দু মন্দির তাঁর সময়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিলো।

তুমি জানো কি ?

'দিন-এ-ইলাহীব' প্রকৃত অর্থ হলো 'স্বর্গীয় বিশ্বাস'।

ইবাদত খানা

ভারতে এক সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আকবর সচেষ্ট ছিলেন। তাইতিনি ফতেপুর-সিক্রীতে ইবাদতখানা নামক এক উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হওয়া এই উপাসনা গৃহে, হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খ্রিষ্টান ও জৈন ধর্মের পণ্ডিতগণ আকবরের নিমন্ত্রণে ধর্মচর্চা করতেন।

তোমার কাজ:
ভারতের মানচিত্রে আকবরের জয় করা রাজ্যদের চিহ্নিত করে নাম লেখো।

চিন্তা করো:
আকবর তোমার বয়সে শাসনভার গ্রহণ করেছিলো, মনে কর তুমি এক রাজ্য পেলে। সেই রাজ্যকে স্থায়ী ও সমৃদ্ধিশালী কিভাবে করবে?

তারপরে আকবর সেসময়ের ধনশালী রাজ্যরূপে পরিচিত গুজরাট জয় করেছিলেন। গুজরাটের বন্দর দিয়ে আরব ও ইউরোপে বাণিজ্য কারবার হতো, সুতরাং রাজকোষে বাণিজ্য কর হিসেবে প্রচুর অর্থ সমাগম হতে লাগলো। সেইরকম বঙ্গেও কৃষি ও বাণিজ্য খুব প্রসিদ্ধ ছিলো। বঙ্গ থেকে চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বণিকরা এসে চীনা মাটির বাসন ও মসলার বদলে নানা প্রকার বস্ত্র কিনতেন। আকবর বঙ্গ জয় করে বিশেষ ভাবে লাভবান হয়েছিলেন। আকবর ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি কাশ্মীর, সিন্ধু ওড়িশা কান্দাহার জয় করে নিয়েছিলেন। কেবল আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারত আকবরের অধীনে ছিলো। মধ্য এশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলো ও মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত রইলো। আকবর দক্ষিণ ভারতের খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগর রাজ্যের কিছু অংশ জয় করে নিয়েছিলেন।

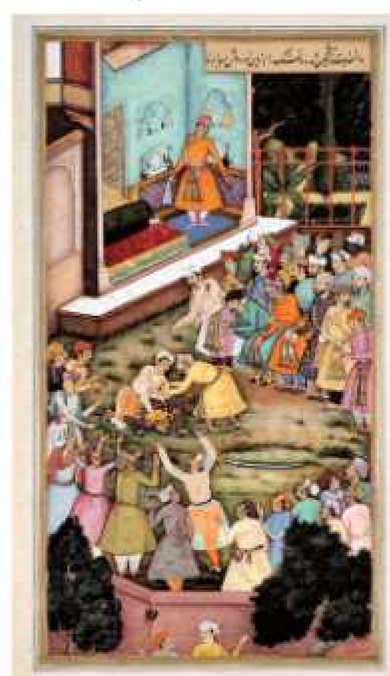

আকবরের শাসন:

আকবরের শাসন নীতি ছিলো প্রজামঙ্গলকারী। রাজা ছিলেন শাসনের সর্বোচ্চ কর্তা। তিনি সেনাবাহিনীর প্রধানও ছিলেন। এবং ন্যায়াধীশ শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেক রাজকার্মচারীকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে দেওয়ান অর্থ বিভাগ, বক্সি সৈন্য বিভাগ, কাজী আইন ও বিচার বিভাগ এবং ডাক চৌকি দারোগা ডাক ও গুপ্তচর বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন। আকবর নিজের রাজ্যকে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।

সর্ব ধর্মের সার কথা নিয়ে তিনি এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। তা দিন-ই-ইলাহী নামে প্রসিদ্ধ। এই ধর্ম গ্রহণ করতে তিনি কাউকেও বাধ্য করেননি।

বুলন্দ দরওয়াজা

কলা ও সাহিত্য:

আকবরের রাজত্বে কলা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিলো। আগ্রার নিকটবর্তী ফতেপুর সিক্রীতে তিনি এক নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। সেথায় লালপাথরের অতি মনোরম এক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে বুলন্দ-দরওয়াজা নামে এক বিশাল সুন্দর ফটক নির্মাণ করেছিলেন।

আকবরের সময়ে সংস্কৃত, আরবী, পার্সী ও হিন্দি ভাষার সাহিত্যের এবং ভাষার প্রসার লাভ হয়েছিলো। পার্সী রাজভাষা ছিলো। তাঁর রাজদরবারে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবুল ফয়জল 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' নামে দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ পার্সী ভাষায় রচনা করেছিলেন। মহাভারত ও রামায়ণও পার্সী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। তুলসী দাস হিন্দীতে রচনা করেছিলেন, যা 'রামচরিতমানস' নামে পরিচিত। বিখ্যাত তানসেন আকবরের দরবারে শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭):

আকবরের উত্তম শাসনের জন্য মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধিশালী হতে পেরেছিলো। সুতরাং আকবরের উত্তরাধিকারীদের যথা- জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজ্য শাসন করতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁব পুত্র জাহাঙ্গীর আগ্রায় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিবাহ করেন। নূরজাহান অত্যন্ত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। নিজের রূপ, গুণ ও বুদ্ধির বলে তিনি জাহাঙ্গীরকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। জাহাঙ্গীর যখন বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করে শাসনকার্য্য অবহেলা করতেন, তখন নূরজাহান অনেক সময় শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন। সরকারী কাগজপত্র ও নির্দেশনামায় নূরজাহান মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুসারে সই করতেন। সে সময়ের মুদ্রায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের নামও থাকতো।

জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন করে নিজের কৃতিত্ব দৃঢ় করতে পেরেছিলেন।

মেবারের রাজা অমরসিংহ জাহাঙ্গীর সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের পাহাড়ী দুর্গ কাংড়া অধিকার করে নিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর রাজ্য তাঁর অধীনে এসেছিলো। তিনি তাঁর পিতার মতো রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন।

ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ তাঁর দূত সার্ টমাস্ রোকে জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। স্যার্ টমাস্ রো জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যের সুবিধা হাসিল করেছিলেন।

রাজকুমার খুররম্ এবং শাহাজাহান তাঁর শাসনের শেষ বর্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুলতানের মৃত্যু হয়।

শাহাজাহান (১৬২৭-১৬৫৮):

শাহাজাহান

জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহাজাহান পিতার মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত ও দাক্ষিণাত্য প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এর পরে তিনি বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। কান্দাহার দুর্গের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শাহাজাহান বহু চেষ্টা করে এক পারস্যের সম্রাটের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার তাকে হারিয়েছিলেন। তিনি তিনবার কান্দাহার দুর্গ অধিকার করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। শেষে তিনি আহম্মদনগর জয় করেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা শাহাজাহানের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শাহাজাহান নিজের পুত্র ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদাররূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

শাহাজাহানের রাজত্বকালে মোগল কলা ও স্থাপত্য বিকাশের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। আগ্রায় যমুনা নদীর কূলে অবস্থিত 'তাজমহল' শাহাজাহান নিজের পত্নী মুমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী করেছিলেন। এই তাজমহল আজও তার অপূর্ব স্থাপত্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য দর্শককে বিমুগ্ধ করে রেখেছে।

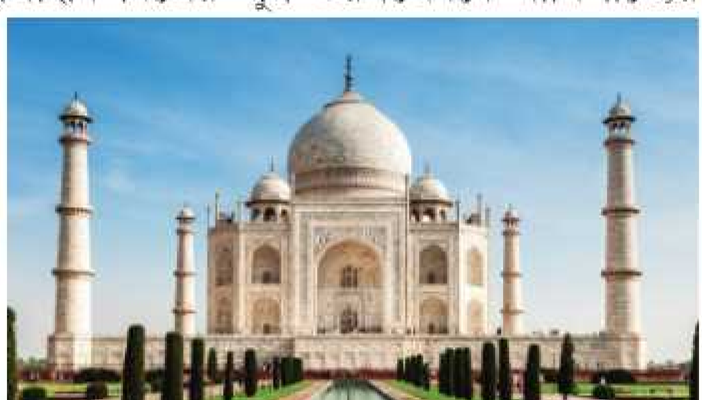

তাজমহল

তাজমহল বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে একটির স্থান পেয়েছে। এছাড়া শাহাজাহান জুমা মসজিদ, মোতি মসজিদ প্রভৃতি সুন্দর কারুকার্য্যপূর্ণ স্থাপত্য নির্মাণ করিয়েছেন। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে যমুনা নদীর কূলে শাহাজাহানাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। এখানে লালকেল্লা বা রেড্ ফোর্ট নির্মাণ করা হয়েছিলো। এই দুর্গের মধ্যে থাকা সৌধদের মধ্যে মোতি মহল, হীরা মহল, রং মহল, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বছর বয়সে শাহাজাহান ৮ বছর বন্দীশালায় কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭):

পিতা শাহাজাহান জীবিত থাকাকালীন ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঔরঙ্গজেব

ধর্মনীতি:

ঔরঙ্গজেব একজন নৈষ্ঠিক মুসলমান ছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ মনোভাব ছিলো। পুনরায় হিন্দুদের ওপর তিনি জিজিয়া ও তীর্থযাত্রী কর বসিয়েছিলেন। রাজপুতদের হতাহত করা ও শিখেদের ওপর অত্যাচারের ফলে দেশের চারিদিক অশান্তি দেখা দিলো। যার ফলে জাঠ, শিখ, সতনামী, বুন্দেল, রাজপুত ও মারাঠীরা ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দু বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

রাজ্যজয় ও বিদ্রোহ দমন:

ঔরঙ্গজেব আসাম ও কুচবিহার জয় করেছিলেন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে তিনি সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মথুরার জাঠ ও পাঞ্জাবের সতনামীদের বিদ্রোহ দৃঢ় হস্তে দমন করেন। মেওয়াড়ের রাজা জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্গাদাসের নেতৃত্বে মারওয়াড়ের রাজপুতগণ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে তাঁর অধীনতা অস্বীকার করেছিলেন।

তুমি জানো কি?
ঔরঙ্গজেব নৈষ্ঠিক মুসলমান ছিলেন। তিনি কেবল মুসলমানদের ভালোবাসতেন।

শিখেদের নবমগুরু তেগবাহাদুরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টায় অসফল হয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করেন। এর ফলে শিখদের দশম ধর্মগুরু গোবিন্দ সিং পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন।

চিন্তা করো:
তোমার মতে একজন রাজার ধর্মনীতি ও রাজ্যশাসন নীতির মধ্যে কোনটা প্রধান ও কেন ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টিতে চিন্তা করো।

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ দাক্ষিণাত্যে ক্রমশ ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু আহম্মদনগর, গোলকোন্ডা ও বিজাপুর জয় করে ঔরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল তিনি পর্তুগীজ ও ইংরেজদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি পর্তুগীজ জলদস্যুদের জব্দ করে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব ইংরেজ জলদস্যুদের দমন করে তাদের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি একজন সংযমী ও কর্তব্যপরায়ণ রাজা ছিলেন। অন্য মোগল সম্রাটদের মতো তাঁর জীবন বিলাসময় না হয়ে সরল ও নিরাড়ম্বর ছিলো।

নিম্নলিখিত টেবিলে ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করা মোগল সম্রাটদের নাম ও সময় তালিকা করো।

নাম	খ্রীষ্টাব্দ

মোগল শাসকদের অন্য শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক:

মোগলরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। ভারতের যেসব রাজা বশ্যতা স্বীকার করতেন না, তাদের বিরুদ্ধে মোগলরা যুদ্ধ করতেন। তাই ভারতের অনেক শাসক তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে আগুয়ান হতেন। তাদের মধ্যে রাজপুতরা সর্বপ্রথম ছিলেন। অনেক রাজপুত রাজা তাঁদের কন্যাদের মোগল পরিবারে বিয়ে দিয়ে মোগল দরবারে উঁচু পদ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে জাহাঙ্গীরের মাতা অম্বরের (জয়পুর) শাসক রাজার কন্যা ছিলেন। শাহাজাহানের মাতা রাঠোর রাজকুমারী ছিলেন, যিনি মাড়ওয়ার (যোধপুর) শাসক ছিলেন।

> **চিন্তা করো:**
> তোমার মতে একজন শাসকের তার প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক রাখা উচিত?

শিশোদীয় রাজপুতগণ মোগল শাসকদের বশ্যতা স্বীকার করতে মানা করেছিলো। মোগলরা তাঁদের পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের যথাযথ সম্মান দিয়ে তাঁদের জমি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শত্রুরা পরাজিত হলেও মোগলরা তাঁদের উপযুক্ত সম্মান দিতেন। এর ফলে অনেক রাজপুত রাজাদের ওপর মোগল শাসকরা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব শাসক থাকার সময় শিবাজীকে অপমানিত করার ফলে তার কুপ্রভাব মোগল সাম্রাজ্যের ওপর পড়েছিলো।

মোগল শাসন:

মোগলরা ভারতে যে কেবল বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, সুশাসনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুশাসন করার জন্য মোগল সম্রাট আকবর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

আকবরের শাসননীতি ছিলো কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্র। রাজা ছিলেন শাসনের সর্বোচ্চ কর্তা, সৈন্য বাহিনীর প্রধান ও সর্বোচ্চ ন্যায়াধীশ। শাসনে পরামর্শ দেবার জন্য মন্ত্রী পরিষদ ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন।

শাসনের সুপরিচালনার জন্যে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে ১৪টি সুবায় বা প্রদেশে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক সুবাকে একজন সুবেদার শাসন করতেন। তাঁর কাছে অনেক নিম্নপদস্থ কর্মচারী থাকতেন। প্রত্যেক সুবা কয়েকটি সরকার বা জেলাতে বিভক্ত ছিলো। এর শাসন কাজের জন্য চারজন কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। প্রত্যেক সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিলো এবং প্রত্যেকটির জন্য চারজন করে কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগণা গঠিত হতো।

সামরিক শাসন বা মনসবদারী প্রথা আকবর প্রচলন করেছিলেন।

আকবরের সময় তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া কর ও তীর্থ কর তুলে নিয়েছিলেন। ভূ-রাজস্ব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আয় ছিলো। উৎপাদনের ১/৩ অংশ ভূ-রাজস্বরূপে নেওয়া হতো।

> **চিন্তা করো:**
> মোগলদের শাসন প্রাণালীর সঙ্গে বর্তমানের ভারতের শাসন প্রণালীর কি সামঞ্জস্য আছে

আকবরের বিচার ব্যবস্থাও খুব উন্নত ধরনের ছিলো। হিন্দুদের জন্যে হিন্দু বিচারপতি নিয়োগ করা হতো।

মোগল শাসকদের ধর্মনীতি:

মোগল সম্রাটরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও কেবল ঔরঙ্গজেবকে বাদ দিলে অন্য সবাই খুব উদার ছিলেন। প্রাচীন কাল থেকে ভারতে সৃষ্টি হওয়া ধর্ম ভাবনার প্রতি তাঁরা সম্মান করতেন। এই সময় ভারতে, শৈব, বৈষ্ণ, শিখ, ইসলাম, খ্রীশ্চান, জৈন এবং জরাথুষ্ট ধর্মও প্রচলিত ছিলো। ফলে সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিলো।

তুমি জানো কি ?
আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ধনী, গরীব, ক্ষমতাবান ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সমান ন্যায় বিচার পেতেন।

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে মহানুভব আকবরের দিন-ই-ইলাহী ধর্ম ছিলো সব থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করে এক সর্বভারতীয় জাতি গঠন করা আকবরের উদ্দেশ্য ছিলো। আকবর হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া ও যাত্রীকর তুলে নিয়ে সব ধর্মের লোকেদের সমান সুবিধা সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে হিন্দুদের কোনো উচ্চপদ পদবীতে নিযুক্তি দেওয়া হতো না। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু বিরোধী নীতির জন্যে মোগল সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগিয়ে গেলো।

মোগল শাসকদের ধর্মনীতির মধ্যে কার ধর্মনীতি ভালো লাগছে ও কেন ? চিন্তা করে লেখো।

মোগল শাসনকালে লোকেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা:

মোগল শাসনকালে সম্রাট সমাজের প্রথম নাগরিক ও সম্রাজ্ঞী প্রথম মহিলারূপে গণ্য হতেন। তৎকালীন মুসলমান সমাজ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিলো। সম্রাটের পরে সমাজে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সর্বনিম্ন শ্রেণী ছিলো। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা বিলাস বৈভবে জীবন যাপন করতেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ব্যবসায়ী, লেখক, বৈদ্য, কলাকার ইত্যাদি ছিলেন। নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে কৃষক, শ্রমিক, সোনারী, বণিক ইত্যাদি ছিলেন। এদের অবস্থা শোচনীয় ছিলো। সুলতানী শাসনের মতো মোগল সাম্রাজ্যেও দাসত্ব প্রথা চালু ছিলো।

মুসলমানরা ভোজনে ভাত, রুটি ও বিভিন্ন প্রকার মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতেন। বিরিয়ানী এবং কচম্বর তাদের প্রিয় খাদ্য ছিলো। তারা আপেল, আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফল খাওয়ার সঙ্গে রঙীন সরবত পানীয়রূপে গ্রহণ করতো। হিন্দুদের প্রিয় খাদ্য ছিলো ভাত ও খিচুড়ি। উত্তর ভারতের লোকেদের বিশেষ করে হিন্দুদের প্রধানত রুটি প্রিয় ছিলো। পুজো পার্বণে হিন্দুরা পুরী, লুচি, পায়েস প্রভৃতি খাদ্য ভোজন করতো।

চিন্তা করো:
মোগল যুগে যেরকম সমাজ শ্রেণী বিভাগ ছিলো, বর্তমানে আমাদের সমাজে আছে কি ?

মোগল শাসকেরা দামী দামী পোষাক পরতেন। মুসলমান রমণীগণ সালোয়ার কামিজ পরতেন। তারা কাজল, আতর, গোলাপজল, নখরঞ্জক, মেহেন্দী প্রভৃতি প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করতেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরাও দামী পোষাক পরতেন। সাধারণ জনতা মোটা সূতীর কাপড় পরতেন ও মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। নারীরা সিঁদুর, কাজল, আতর, নখরঞ্জক প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। এবং শরীরে চিতা কাটাতেন। (চিতা - তিলক)

সেই সময়ের মুসলমানদের কোন খাদ্য এখনও তাঁদের প্রিয় খাদ্য। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মোগল যুগের সম্রাট ও সম্ভ্রান্তরা নৌবিহার, তলোয়ার খেলা, ঘোড়দৌড়, তীরন্দাজ ইত্যাদি করে অবসর সময় কাটাতেন। এই সময় হিন্দুগণ, মল্লযুদ্ধ, কুস্তী, শিকার প্রভৃতি বিনোদন করতেন। তৎসহ পাশা খেলা, বাদ্যবাদ্যি, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও জাদু খেলা প্রভৃতি করতেন।

মোগল যুগে হিন্দু ও মুসলমান নারীদের ব্যবহার্য্য পোষাক ও প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে এখন কি কি ব্যবহার হচ্ছে লেখো।

মুসলমানেরা মুহর্‌রম, ইদ্‌ এবং হিন্দুরা জন্ম উৎসব, নামকরণ, মুণ্ডন কর্ম, রাখীবন্ধন, দীপাবলী, শিবরাত্রী, রাম নবমী ইত্যাদি পুজো পার্বণ পালন করতেন।

মোগল যুগে মুসলমানেরা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করতেন আর হিন্দুরা টোল বা পাঠশালায় পড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে যেতেন।

সাহিত্য, কলা ও স্থাপত্যের বিকাশ:

মোগল রাজত্বে পার্সী, আরবী, উর্দু ও হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি সাধন হয়েছিলো। মোগল দরবারে অনেক সাহিত্যিক, কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। আকবর নিজে লেখাপড়া জানতেন না, তা সত্ত্বেও সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি তাঁর খুবই আগ্রহ ছিলো। বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেব নিজের আত্মজীবনী লিখে মোগল যুগের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। কবীর ও তুলসীদাসের গ্রন্থগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। অন্ধ কবি সুরদাস 'সুরসাগর' রচনা করেছিলেন। রসখাঁয়ের ভক্তি গীতিগুলির মধ্যে 'প্রেম বটিকা' প্রসিদ্ধ। অনেক প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ পার্সী ভাষায় অনুদিত হয়েছিলো। সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছিলো।

কলা ও স্থাপত্য:

মোগল যুগের কলা ও স্থাপত্য কেবল ভারতেই নয়, সারাবিশ্বে আদৃত হয়েছিলো। মোগল বংশের জনপ্রিয় শাসক আকবর এবং শাহাজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় সে যুগে কলা ও স্থাপত্যের চরম উন্নতি হয়েছিলো। শাহাজাহানের রাজত্বকাল মোগল কলা ও স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলে প্রসিদ্ধ।

মোগল সম্রাটরা অজস্র অর্থব্যয় করে মনোরম প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, সমাধি, সৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আকবরের সময় আগ্রার দুর্গ ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ প্রভৃতি লাল পাথরে নির্মিত হয়েছিলো। কিন্তু শাহাজাহান শ্বেতপাথরের ব্যবহার প্রচলন করেন। যমুনা নদীর তীরে 'তাজমহল' শাহাজাহানের অদ্বিতীয় কীর্তি। তাঁর অন্যান্য কীর্তির মধ্যে মোতি মসজিদ, লাল কেল্লা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই সব কীর্তি ইসলাম ও ভারতীয় কলা শৈলীতে নির্মিত হয়েছিলো। এতদ্ব্যতীত হীরা মুক্তা খচিত বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন শাহাজাহান নির্মাণ করেছিলেন।

> মোগল সম্রাটদের তৈরী করা কীর্তিগুলোর তালিকা করো। তাদের মধ্যে কোনগুলি বর্তমান আছে? বুঝে লেখো।

জাহাঙ্গীরের সময় চিত্রকলার প্রভূত বিকাশ হয়েছিলো। তিনি সার্ টমাস্রোর, সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিসন দাস তাঁর দরবারে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন।

আমরা কি শিখলাম:

- তুঘলক বংশের পতনের পর ভারতে সুলতানী শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিলো।
- বাবর প্রথম পানিপথ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মোগল বংশের পত্তন করেছিলেন।
- বাবরের পরে মোগল সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান ও ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসে ভারত শাসন করেছিলেন।
- মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
- আকবর সর্ব ধর্মের সার কথা নিয়ে দীন-ই-ইলাহী নামে এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন।
- শাহাজাহান তাজমহল তৈরী করেছিলেন। মোগল সম্রাটগণ অনেক মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন।
- সুশাসন করার জন্য মোগল সম্রাট আকবর বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন। মোগল সময়কে স্থাপত্য ও কলার স্বর্ণ যুগ বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১. নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(ক) তুঘলক বংশের পতনের পর সুলতানী শাসন দুর্বল হয়ে পড়লো কেন?

(খ) বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন কিভাবে?

(গ) হুমায়ুন কি কি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন?

(ঘ) শের খাঁ হুমায়ুনকে কিভাবে অসুবিধায় ফেলেছিলো?

(ঙ) আকবর মোগল সাম্রাজ্যের স্থিতি কিভাবে দৃঢ় করেছিলেন?

(চ) হলদীঘাট যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল? যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিলো?

(ছ) আকবর কেন উদার ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন?

(জ) নূরজাহান কে? জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তাঁর কি ভূমিকা ছিলো?

(ঝ) শাহাজাহানের সফল কীর্তিগুলো কি ছিলো?

(ঞ) ঔরঙ্গজেবের হিন্দুদের প্রতি মনোভাব কি ছিলো?

(ট) মোগল শাসকদের অন্য শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক কিরকম ছিলো?

(ঠ) মোগলদের ধর্মনীতি কিরকম ছিলো?

(ড) মোগল শাসনের সময় লোকেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিলো?

(ঢ) মোগল রাজত্বে ভাষা ও সাহিত্যের কতটা উন্নতি হয়েছিলো?

(ণ) মোগল শাসনকালকে কলা ও স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

২. নিচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যেটা ঠিক তার কাছে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও।

(ক) বাবরের নাম পিতার নাম কি?

( ) শেখর মির্জা ( ) উমর শেখ মির্জা ( ) শেখ্ উমর মির্জা () শেখ্ মির্জা?

(খ) ঘর্ঘরা যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিলো?

( ) ১৫২৯ ( ) ১৫৩০ ( ) ১৫৩১ ( ) ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে

(গ) পারস্যের বর্তমান নাম কি?

( ) ইরাক ( ) কুয়েৎ ( ) সৌদি আরব ( ) ইরান

(ঘ) আকবরের অভিভাবকের নাম কি ছিলো?

( ) বৈরাম খাঁ ( ) ছোটে খাঁ ( ) বড়ে খাঁ ( ) উমর খাঁ

(ঙ) আকবর নিজের সাম্রাজ্যকে কত সুবায় ভাগ করেছিলেন?

( ) ১২টি ( ) ১৩টি ( ) ১৪টি ( ) ১৫টি

(চ) আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি ছিলো?

( ) আলিম ( ) সেলিম ( ) খুরম ( ) হালিম

(ছ) মোগল শাসনের সময় গ্রাম নিয়ে কি গঠিত হয়েছিলো ?

( ) জেলা ( ) রাজ্য ( ) পরগণা ( ) দেশ।

(জ) অন্ধ কবি সুরদাস কি রচনা করেছিলেন ?

( ) সুরসাগর ( ) অমৃত সাগর ( ) রামচরিতমানস ( ) প্রেমবটিকা

(ঝ) ফতেপুর সিক্রী রাজপ্রাসাদ কোন পাথরে নির্মিত হয়েছিলো ?

( ) মুগুনি পাথর ( ) লাল পাথর ( ) মার্বেল পাথর ( ) নীল পাথর

৩. ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো।

(ক) বাবর চেঙ্গিস খাঁয়ের বংশধর ছিলেন।

(খ) হুমায়ুন মহম্মদ শাহকে পরাস্ত করে গুজরাত ও মালব অধিকার করেছিলেন।

(গ) মান সিংয়ের নেতৃত্বে মোগলরা হলদীঘাট যুদ্ধে রানা প্রতাপ সিংকে পরাস্ত করেছিলো।

(ঘ) বীরবল আকবরের দরবারে শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

(ঙ) লাল কেল্লা আকবর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(চ) ঔরঙ্গজেব শিখেদের নবম গুরু গোবিন্দ সিংকে হত্যা করেছিলেন।

(ছ) মাড়ওয়াড়ের বর্তমান নাম হচ্ছে জয়পুর।

(জ) আকবর উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ ভূ-রাজস্বরূপে নিতেন।

(ঝ) মোগল শাসনকালে মুসলমানেরা ৫ ভাগে বিভক্ত হয়েছিলো।

(ঞ) রমু খাঁ সুরসাগর রচনা করেছিলেন।

৪. 'ক' স্তম্ভের সময়কে 'খ' স্তম্ভের ঘটনার সঙ্গে দাগ দিয়ে জোড়ো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ	আকবরের ইবাদত খানা নির্মাণ।
১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ	জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ।
১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ	শাহাজাহানের মৃত্যু।
১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ	ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণ।
১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ	হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণ।
	আকবরের মৃত্যু।

তোমার কাজ

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীর্তির ফটোচিত্র সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরী করো।

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপীয়দের ভারত আগমন

ভারতের জলপথ আবিষ্কার:

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করে যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপীয়রা ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলো। পট্টবস্ত্র, লবঙ্গ, গোলমরিচ প্রভৃতি মসলা, মূল্যবান পাথর, হাতীর দাঁতের মতো বিলাস সামগ্রী এসব ইউরোপীয় দেশের লোকেদের খুব প্রিয় বলে এসব প্রচুর পরিমাণে ভারত থেকে ইউরোপে রপ্তানী হতো।

তুমি জানো কি ?

প্রথম শতাব্দীতে রোমের শাসক অগস্টাস্ এর সময়কালে রোম ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক চরম সীমায় পৌঁছেছিলো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালির মার্কোপোলো নামে এক সাহসী যুবক এশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি ভারতের হীরে, মুক্তো, সূক্ষ্ম-বস্ত্র ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট জিনিসের বিষয়ে লোকেদের কাছে বর্ণনা করলেন। মার্কোপোলোর এই বর্ণনা শুনে বহু ইউরোপীয়কে ভারতে আসায় উৎসাহিত করলো। কিন্তু তখন ইউরোপ থেকে ভারতে আসার কোনো সোজা রাস্তা ছিলো না। তাই ভারতের উৎপাদিত জিনিসগুলো কাবুল আফগানিস্তান, পারস্য, কনস্টান্টিনোপল হয়ে বহু ঘুরপথে ইউরোপীয় দেশে পৌঁছতো। ঘুর পথে উৎপাদিত জিনিস পৌঁছতো বলে তার মূল্য অত্যধিক হয়ে যেতো। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য চালু ছিলো।

ষোড়শ শতাব্দীর জাহাজের নমুনা

তোমার অঞ্চলের কোন কোন জিনিস বাইরে পাঠানো হচ্ছে লেখো।
জলপথে মাল পরিবহণ বেশী সুবিধাজনক কেন ? অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করেছিলো। ফলে এই দেশ দিয়ে ভারত থেকে ইউরোপে

মাল পরিবহণ বন্ধ হয়ে গেলো। তাই ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য কারবার বন্ধ হয়ে গেলো। এই জন্যে কোনো সিধে জলপথ আবিষ্কারের জন্যে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পেলো। ক্রমে এই আগ্রহ বাস্তবরূপ নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হলো।

ভাস্কো-ডা-গামা

পর্তুগীজদের ভারতে আগমন:

ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতের জলপথ আবিষ্কারে পর্তুগীজরা এগিয়ে। এই কাজের জন্য বহু পর্তুগীজ নাবিক নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্যম নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বার্থেলমিওডায়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকা উপকূলের উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আসতে পেরেছিলো। পরে পর্তুগীজ সরকারের রাজকর্মচারী কলম্বাস ভারতের জলপথ আবিষ্কারে বেরিয়ে ভারতের বদলে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন। এর প্রায় ছ'বছর পরে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন ইতালীয় নাবিক ভারতের জলপথ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতে পৌঁছনোর জন্য তিনি তিনটি জাহাজ নিয়ে পর্তুগাল থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। তিনি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজ চালিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছলেন। তারপরে ভারত মহাসাগর দিয়ে যাত্রা করে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ১৪৯৮ সালে কালিকট অঞ্চলে পৌঁছলেন। এর ফলে ভারতের জলপথ আবিষ্কার হয়ে গেলো।

তুমি যদি সেই সময় ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে জলপথে ভারত যাত্রা করতে, সঙ্গে কি কি নিতে, লেখো।

মানচিত্র দেখে ভাস্কো-ডা-গামা কোন পথ দিয়ে ভারতে পৌঁছেছিলেন, চিহ্নিত করে তাদের নাম লেখো।

তখন কালিকটে জামোরিণ নামে হিন্দু রাজার শাসন ছিলো। তিনি ভাস্কো-ডা-গামাকে আতিথ্য প্রদান করে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন এবং ভাস্কো-ডা-গামাকে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ভাস্কো-ডা-গামার জলযাত্রার উদ্দেশ্য সফল হলো। এর ফলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো।

তুমি জানো কি?

ভাস্কো-ডা-গামা সমুদ্র পথ দিয়ে পর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বনে ফেরার সময় চারটি জাহাজ ও ১৭০ জন লোককে হারিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মাত্র ৫৪ জন লোক নিজের দেশে ফিরেছিলেন।

পর্তুগীজ:

ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটে ৬ মাস থেকে অনেক মশলাজাত দ্রব্য জাহাজে নিয়ে পর্তুগাল ফিরে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে পৌঁছলেন। তিনি পর্তুগীজ রাজ দরবারে ভারতে ইউরোপীয় দ্রব্যের চাহিদার কথা প্রকাশ করলেন। ফলে ভারতে বাণিজ্য ব্যবসা করার জন্য পর্তুগীজ লোকেরা খুব উৎসাহিত হলো। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পেড্রো আলভারেজ কাব্রেল্ নামে একজন নাবিক ১৩টি বাণিজ্য পোত নিয়ে লিস্‌বন থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু রাজা জামোরিণের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়ায় কাব্রেল কালিকট ছেড়ে কোচিনে আশ্রয় নেয়।

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা পুনরায় কালিকটে পৌঁছলেন। জামোরিনের অনুমতিতে সেখানে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মিত হলো। ১৫০০ থেকে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজদের সঙ্গে আরবদের যুদ্ধ লেগে রইলো। শেষে আরব বাণিকদের প্রভাব লোপ হয়ে মালাবার উপকূলে পর্তুগীজদের প্রাধান্য স্থাপিত হলো।

তুমি জানো কি?

- ভারতে পর্তুগীজ গভর্নর কেবল ৩ বছরের জন্য নিযুক্তি পেতেন।
- ফ্রানসিস্কো-ডি-আলমিডা প্রথম পর্তুগীজ গভর্নর ছিলেন।
- আলবুকার্ককে পর্তুগীজ ইতিহাসে ক্লাইভের স্থান দেওয়া হয়।
- পর্তুগীজদের দুর্বল শাসন প্রণালী, ত্রুটিপূর্ণ বাণিজ্য ব্যবস্থা, হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি মনোভাব, পরস্পরের মধ্যে কলহ ও ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনা তাদের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিলো।

পর্তুগীজ ও আরবদের মধ্যে কি কি কারণে কলহ ঝগড়া হতো, তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

পরবর্তীকালে পর্তুগালের রাজার দ্বারা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতে পর্তুগীজ গভর্নরদের মধ্যে আলবুকার্ক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী গভর্নরদের শাসনকালে দিউ, দমন, সালসেট্‌বেসিন, বম্বে ও বঙ্গ দেশের হুগলী প্রভৃতি স্থান অধিকৃত হয়েছিলো। তাঁরা প্রায় ১০০ বছর বাণিজ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বাণিজ্যক্ষেত্রে পর্তুগীজদের প্রভাব লোপ পেয়েছিলো।

আলবুকার্ক পর্তুগীজদের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ডাচ্ বা ওলন্দাজ:

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে হল্যান্ডের অধিবাসী বা ডাচেরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা ডাচ্ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক এক বাণিজ্য সংস্থা গঠন করেছিলেন। ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে গরম মশলা পাঠানো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো। ডাচেরা পর্তুগীজদের পরাস্ত করে অনেক অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। তারা গুজরাত, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গবিহার অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি তৈরী করেছিলো। এছাড়া মজলিপট্টম, সুরাত, কাশিমবাজার, কোচিন ও বালেশ্বরে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত করেছিলেন। ভারতে ইংরেজরা আসার পরে ডাচেরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবশেষে তাঁরা ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রতিরোধ না করতে পেরে ভারত ত্যাগ করে জাভা, সুমাত্রা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলো। এছাড়া ডেনমার্কের অধিবাসী বা দিনেমার লোকেরা বঙ্গদেশের শ্রীরামপুরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন।

ডাচেরা ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার কারণ কি? অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী:

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের কয়েকজন বণিক ও নাবিক মিশে এক বাণিজ্য সংস্থা গঠন করেছিলেন। এই সংস্থাকে ইংল্যান্ড রানী এলিজাবেথ বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত হয়েছিলো। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে জাভা ও সুমাত্রায় বাণিজ্য করতো। সেখানে ডাচেদের সঙ্গে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো। তাই তারা ভারতে বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

তুমি জানো কি?

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকাল ইংল্যান্ড ইতিহাসে সুবর্ণকাল ছিলো।

এলিজাবেথের শাসনকালে নাবিক ফ্রান্সিস্ ডেক জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

এই কার্য্যের জন্য তারা তখনকার ভারতের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজরা ক্যাপটেন হকিন্স্‌কে পাঠিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর খুব খুশী হয়ে তাঁকে সুরাতে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করতে সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রে হকিন্স্‌ কোনো সুবিধে হাসিল করতে না পেরে ইংল্যান্ড ফিরে গিয়েছিলেন।

তুমি তখন ক্যাপ্টেন হকিন্স্‌ হয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে গেলে বাণিজ্য করার জন্যে কিভাবে অনুমতি হাসিল করতে লেখো।

ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্‌ সার টমাস রো নামে একজন বিচক্ষণ রাজদূতকে জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠিয়ে অনেক বাণিজ্য সুবিধে হাসিল করেছিলেন। তিনি ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারত থেকে বিদায় নিলেন, তখন আগ্রা, আহমদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিলো। এর পরে ইংরেজরা ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে বাণিজ্য কুঠি করার উদ্যম আরম্ভ করেছিলো। ফলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান পোতাশ্রয় মছলিপট্টনম, বম্বে, বঙ্গের সুতানুটি ও ওড়িশার বালেশ্বরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করলেন। এইভাবে ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যের প্রসার বিস্তার করে পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

তুমি জানো কি?

- ইংল্যান্ড রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথেরাইনকে বিবাহ করে বম্বে যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন।
- ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুক সায়ার বঙ্গদেশে বাণিজ্য করতে ইংরেজদের কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধে দিয়েছিলেন।

ইংরেজরা উপকূল অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি কেন নির্মাণ করতেন, তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী:

পর্তুগীজ, ডাচ্‌ ও ইংরেজরা আসার বহু বছর পরে ফরাসীরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন। তারা ভারতে এসে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেছিলেন।প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করা এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো। পরবর্তীকালে ১৬৬৮ সালে কয়েকজন ফরাসী বণিক সুরাতে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছিলো। তার পরে তাঁরা গোলকোণ্ডার সুলতানের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে মছলিপট্টনম স্থানে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছিলেন। পরে তাঁরা পণ্ডিচেরী, বঙ্গদেশের চন্দননগর ও ওড়িশার বালেশ্বরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া মালাবার উপকূলের মাহে বন্দর অধিকার করে ফরাসীরা বাণিজ্য কারবার করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে যুদ্ধের রূপ নিলো। এই যুদ্ধকে কর্ণাট সমর বলা হয়। ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে তিনটে কর্ণাট সমর হয়েছিলো। যুদ্ধে ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে হেরে গিয়েছিলো। ফলে ফরাসীদের বাণিজ্য কারবার বিপর্য্যস্ত হয়ে গেলো এবং তারা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বিফল হলো।

তুমি জানো কি?

প্রথম কর্ণাট সমর:
১৭৪৬-১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

দ্বিতীয় কর্ণাট সমর:
১৭৪৯-১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ

তৃতীয় কর্ণাট সমর:
১৭৫৮-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

আমরা কি শিখলাম

- বহু প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ব্যবসায় হতো।
- ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলো নামে এক যুবক এশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন।
- পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন। ফলে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের জলপথে যোগাযোগ হয়েছিলো।
- ভারতের জলপথ আবিষ্কার হওয়ার পরে, পর্তুগীজ, ডাচ্ ও ইংরেজ এবং ফরাসীরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য কারবার আরম্ভ করেছিলো।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:**

(ক) প্রাচীনকালে ইউরোপের লোকেরা ভারত থেকে কি কি জিনিস আমদানি করতেন?

(খ) ইউরোপীয়রা ভারতে আসতে কেন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন?

(গ) ভারতের বিভিন্ন জিনিস ইউরোপে কেন দুর্মূল্য ছিলো?

(ঘ) ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য কারবার বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি?

(ঙ) পর্তুগীজেরা ভারতের জলপথ আবিষ্কারের কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

(চ) ডাচেরা ষোড়শ শতাব্দীতে কেন ভারতে এসেছিলেন?

(ছ) ১৫৯৯ সালে লন্ডনের কয়েকজন নাবিক ও বণিক মিশে কোন সংস্থা গঠন করেছিলেন? এর ফলে তাঁদের কি লাভ হয়েছিলো?

(জ) ফরাসীরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কেন গঠন করেছিলো ?

(ঝ) কর্ণাট সমর কি ? এটা কেন হয়েছিলো ?

২. **রেখাঙ্কিত পদগুলি বদলে ভ্রম সংশোধন করো।**

(ক) অটোমান তুর্কীরা ১৪৪৮ সালে কনস্টান্টিনোপল দখল করেছিলো।

(খ) বার্থেলমিউ ফরাসী নাবিক ছিলেন।

(গ) পেড্রো আলভারেজ কাব্রেল ৫০টা বাণিজ্য পোত নিয়ে লিসবন থেকে ভারতের অভিমুখে জলযাত্রা করেছিলেন।

(ঘ) ডাচেরা ওড়িশার পারাদ্বীপে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

(ঙ) জাহাঙ্গীর ইংরেজদের ওপরে খুশী হয়ে বম্বেতে তাঁদের বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

(চ) ফরাসীরা মালাবার উপকূলের কোচিন বন্দর অধিকার করেছিলেন।

৩. **ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো:**

(ক) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা ভারতের জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন।

(খ) ভারতের জলপথ আবিষ্কারে ফরাসীগণ আগে ছিলেন।

(গ) শ্রীরামপুর উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত।

(ঘ) ফরাসীরা হকিন্সকে জাহাঙ্গীরের দরবারে বাণিজ্যের সুবিধে হাসিল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

(ঙ) ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৬২ সালে গঠিত হয়েছিলো।

(চ) চন্দননগর ওড়িশায় অবস্থিত।

৪. **সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী দাও:**

ক. ভাস্কো-ডা-গামার ভারতের জলপথ আবিষ্কার।

খ. পেড্রো আলভারেজ কাব্রেল।

গ. ডাচেদের ভারতে বাণিজ্য কারবার।

তোমার কাজ

তোমার অঞ্চলে কি কি জিনিসের কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে লেখো।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ

ভক্তি এবং সুফি ধর্ম অন্দোলন:

কবীরের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পাওয়ায়, বিভিন্ন বৎসর উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: ১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ অঃ

মধ্যযুগে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব পরস্পরের ওপর পড়েছিলো। এরজন্যে উভয় হিন্দু ও মুসলমান সন্তগণ ধর্মক্ষেত্রে থাকা জটিলতাকে দুর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টা ভক্তি এবং সুফি আন্দোলনের জন্ম দেয়।

ভক্তি আন্দোলন:

ভক্তি আন্দোলনের সন্তগণ সরল ও নিড়াম্বর ধর্ম উপাসনার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা ভক্তিকে মুখ্য আধার করে এর সাহায্যে ঈশ্বরকে আরাধনা করার ওপর উপদেশ দিতেন। ভক্তি আন্দোলনের পুরোধাভাবে, কবীর, নানক এবং শ্রীচৈতন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কবীর (১৪৪০-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ):

বেনারসে কবীর নামে এক তাঁতী ভক্তি ধর্মের মহান প্রচারক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে বেনারসে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এক মুসলমান তাঁতী দম্পতি তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। তিনি বলতেন উভয় হিন্দু ও মুসলমান একই ঈশ্বরের সন্তান। তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী নয়। ঈশ্বর এক এবং তাঁর নামে ঝগড়া করা উচিত নয়। বরং প্রেম ভালোবাসাই ধর্ম। ঈশ্বরকে পেতে হলে ভক্তিই একমাত্র উপায় বলে তিনি বলতেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সব কিছুই অস্থায়ী। কবীর জাতপাতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ছ্যুৎ-অছ্যুৎ, ছোট বড় এসব ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবাসার কথা তিনি উপদেশ দিতেন। তাঁর বাণী 'বীজক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থ সরল হিন্দী ভাষায় রচিত। ভজনগুলি দোঁহা নামে প্রসিদ্ধ। কবীরের অনুগামীরা 'কবীরপন্থি' নামক গোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাঁর বাণী জনপ্রিয় করিয়েছিলেন।

কবির

তুমি জানো কি?

দোঁহা—দুই লাইনে রচিত ভজন যা একটা কথা বা ভাবকে বর্ণনা করে। কবীর তাঁর দোঁহার মাধ্যমে ভক্তি আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়েছিলেন।

একজন কবীরপন্থী ভাবে তুমি কোন কোন কথার ওপরে প্রাধান্য দেবে?

গুরু নানক: (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

এই সময় উত্তর ভারতে আর একজন ভক্তি ধর্মের প্রচারক 'নানক' পাঞ্জাবের তলওন্ডিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বলতেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে মানুষ শান্তি ও মুক্তি লাভ করবে। নির্মল মন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে ঈশ্বর প্রাপ্তি সহজ হয়। কবীরের মতো তিনিও বলতেন সব মানুষ সমান এবং ঈশ্বরের সন্তান। তাঁর প্রচারিত বাণী সকল 'আদিগ্রন্থ' বা 'গুরু গ্রন্থ সাহিব'-এ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

গুরুনানক

আদি গ্রন্থ শিখেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

শ্রীচৈতন্য: (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

কবীর ও নানকের মতো শ্রীচৈতন্য ভক্তি ধর্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সর্বপ্রকার পূজা অর্চনাকে নিন্দা করতেন। শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন ও নাম গানের ওপর বেশী জোর দিতেন। তিনি বলতেন প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা ভক্তি, প্রেম, গীত ও নৃত্যের ওপরে নির্ভর করে। সর্বজাতির লোকেরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যবন হরিদাস তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বাণী 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক পুস্তকে সংগৃহীত হয়ে আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব

তুমি জানো কি ?

শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যনাম ছিলো বিশ্বম্ভর বা নিমাই। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচী দেবী। গুরু ঈশ্বরীপুরীর কাছ থেকে তিনি কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভক্তদের সঙ্গে মৃদঙ্গ করতাল এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করে নগর পরিভ্রমণ করতেন।

ভক্তি ধর্মের অন্যান্য সন্থ:

ভক্তি ধর্মের অন্যান্য সন্থদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের জ্ঞানেশ্বর ছিলেন অন্যতম। তিনি গীতাকে মারাঠী ভাষায় লিখে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন। মহারাষ্ট্রের নামদেব এবং তুকারাম ভক্তি আন্দোলনের দুই নেতা ছিলেন। তুকারাম চৈতন্যদেবের মতো ভজন কীর্তন করতেন। এই সন্থদের সরল জীবন অন্যদের প্রভাবিত করতো।

নামদেব

তুকারাম

জ্ঞানেশ্বর

সুফি ধর্ম আন্দোলন:

একাদশ শতাব্দীতে বহু মুসলমান সন্থ ধর্মক্ষেত্রে থাকা জটিলতা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সুফি বলা হতো। সুফি সন্থদের মধ্যে খ্বাজা মইনুদ্দিন চিস্তি অন্যতম ছিলেন। তিনি আজমীরে থাকতেন। শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন আর একজন প্রসিদ্ধ সুফিসন্থ। তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী গিয়াসপুরে থাকতেন। আজোধান (বর্তমান পাকিস্তান)-এর বাবা ফরিদ, গুজরাতের সাহা আলমবুখারী, মুলতানের বাহাউদ্দিন কাজারিয়া, সিলহটের শেখ্ সিয়াউদ্দিন প্রমুখ সে সময়ের অন্যান্য সুফি সন্থ ছিলেন।

তুমি জানো কি?

সুফি—সুফ্ বা উলের পোষাক পরিধান করা মুসলমান সন্থ বা ফকীরকে সুফি বলা হয়।

ভক্তি ও সুফি ধর্ম আন্দোলনের ফলাফল:

ভক্তি এবং সুফি ধর্মের আন্দোলনের ফলাফল উল্লেখযোগ্য। এই ধর্ম আন্দোলন উভয় হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের নিকটবর্তী করেছিলো। এটা এক নতুন ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়েছিলো। কবীর ও নানকের মতো ধর্মগুরুরা সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে খুব নিন্দা করতেন। নারীরা পুরুষের থেকে হীন নয় বলে তাঁরা বিবেচনা করতেন।

রানী মীরাবাঈ

এই সময় রাজস্থানের রাজপুত রানী মীরাবাঈ, কৃষ্ণের ভক্ত হয়ে সুন্দর ও সুললিত ভজন রচনা করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলনের ফলে হিন্দুরা মুসলমানদের পীরকে উপাসনা করে ফকীরদের দান করতেন। সেই রকম মুসলমানেরা হিন্দু দেবতা নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে থাকতেন। এই সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য সুলতান হুসেন শাহর সময়ে বঙ্গদেশে সত্যপীরের উপাসনা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই ভক্তি আন্দোলন ভারতে একতা প্রতিষ্ঠা করায় সহায়ক হয়েছিলো।

তুমি ভক্তি আন্দোলনের সন্থ হলে কি কি উপদেশ দিতে লেখো।

আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার বিকাশ:

মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রভূত বিকাশ হয়েছিলো। তাদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও প্রচলিত আছে।

আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ:

ভক্তি-ধর্ম আন্দোলনের প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছিলো। ভক্তি ধর্মের প্রচারকরা তাঁদের ধর্ম বাণী আঞ্চলিক ভাষায় প্রচার করতেন। তাই তেলেগু, তামিল, কন্নড়, গুজরাতি, মারাঠী, হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া ও পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা ভক্তি সঙ্গীতগুলো লোকেদের কাছে আদৃত হয়েছিলো। সংস্কৃতে লেখা অনেক পুস্তক মাতৃভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিলো। বাংলার নসরত্‌শাহ মহাভারত ও রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।

তুমি জানো কি?

- আমীর খুস্রুর প্রকৃত নাম মহম্মদ হাসান।
- তিনি একজন কবি, ঐতিহাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।
- আমীর খুস্রু পারসিক ভাষার এক নতুন শৈলীর বিকাশ করেছিলেন। এর নাম 'সাবাক-ই-হিন্দ্'।

ওড়িয়া, হিন্দীর মতো আর কোন কোন ভাষা আছে লেখো।

সুফি সন্থরা হিন্দীতে লেখা ভক্তি-সঙ্গীত, বিভিন্ন সঙ্গীত সমারোহে গাইতেন। সুফি সন্থের মধ্যে মালিক মহম্মদ জয়সী 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। আমীর খুস্রু হিন্দীতে অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তুলসী দাস হিন্দীতে 'রামচরিত মানস' রচনা করেছিলেন।

জিয়াউদ্দিন বারানী, মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ এবং ইজামী পার্শী ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। পার্সী, আরবী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষা সৃষ্টি হয়েছিলো। যে ভাষা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিলো।

তুমি জানো কি?

- উর্দু-র অর্থ হচ্ছে ছাউনী। সে সময়ে সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথাবার্তা বলতেন।
- উর্দু ভাষাকে প্রথমে জবান-ই-হুন্ডাভি বলা হতো।

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় তেলেগু ভাষায় 'আমুক্ত মাল্যদা' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই সময় ওড়িশায় ওড়িয়া ভাষায় সারলা দাশের মহাভারত, জগন্নাথ দাশের ভাগবৎ ও বলরাম দাসের দাণ্ডি রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা হয়েছিলো।

ভক্তি আন্দোলনের সময়ে আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ হওয়ার জন্য লোকেদের কি কি সুবিধা হয়েছিল, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখ।

তুমি জানো কি?

মধ্যযুগে বিভিন্ন কৃতী সাহিত্যগুলো হচ্ছে:

সুরদাস—সুরসাগর

- রামানুজ—বেদান্ত সংগ্রহ
- চাঁদ বরদাই—পৃথ্বীরাজ রাসো
- মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ—তবাকত্-ই-নাসিরী
- জিয়াউদ্দিন বারাণী—তারিক্-ই-ফিরোজ শাহী
- আমীর খুস্রু—তারিক্-ই-আলাহী

চিত্রকলার বিকাশ:

মধ্যযুগে দেওয়ালে, প্রাচীরে বড় বড় চিত্রাঙ্কন করা হতো। রাজপ্রাসাদ এবং প্রাচীরে সুন্দর সুন্দর চিত্র এঁকে সৌন্দর্য্য বর্ধিত করা হতো। সুলতানী শাসনের সময় বইকে সুন্দর করার জন্যে ছোট ছোট চিত্র এঁকে রঙীন করা হতো। অনেক সময় রাজাদের চিত্রকে রং দিয়ে সুন্দর করা হতো। আকবর চিত্রকরদের জন্য তসবীরখানা নির্মাণ করেছিলেন। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্রকর এসে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকতেন।

এই চিত্রকরেরা ভারতীয় ও পার্সী চিত্র কলার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন চিত্রকলা শৈলীর বিকাশ করেছিলেন। সাধারণত শিকার, পশু, পক্ষী ও রাজ দরবারের দৃশ্য চিত্রকলায় বিশেষ স্থান পেতো। সে সময় চিত্রে লাল ও উজ্জ্বল নীল রঙয়ের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হতো।

মোগল চিত্রকলা

আকবর অনেক দক্ষ চিত্রকরকে চিত্র এঁকে তৈরী করার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন।

মধ্যযুগীয় দাক্ষিণাত্য চিত্রকলা

আকবরের চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দসবন্ত ও বসওয়ালি। আকবর ব্যতীত অন্য মোগলশাসক ও দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশিক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার অনেক উন্নতি হয়েছিলো।

যদি আকবরের দরবারে চিত্রকর হিসেবে নিযুক্ত হতে, তাহলে তুমি কি ধরনের চিত্র আঁকতে লেখো।

তুমি জানো কি?

❖ আকবর ১৭ জন চিত্রকরকে চিত্র আঁকার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১৩ জন হিন্দু ছিলেন।

সংগীত কলার বিকাশ:

মধ্যযুগীয় রাজা ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীত কলার উন্নতি হয়েছিলো। সুফি ও ভক্তি ধর্মের প্রচারকগণ সংগীত সমাবেশের আয়োজন করে ভক্তি সংগীতকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। আমীর খুস্রুর কাওয়ালির মাধ্যমে সুফি ধর্মের সংগীত জনপ্রিয় হওয়া এবং ভক্তি ধর্মের গানগুলো কীর্তন মাধ্যমে লোকেদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলো।

সংগীত সম্মেলনে কি করা হয়, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ভারতীয় ও পার্সী সংগীতের মিলনে ভারতের প্রচলিত শাস্ত্রীয় সংগীতের উন্নতি হয়েছিলো। আমীর খুস্রু শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পার্সিয়া-আরবী সংগীত লোকেদের কাছে পরিচিত করেছিলেন। এছাড়া তিনি একজন পরিচিত কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর হাতেই সেতার বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ হয়। সেই সময় তবলা ও সারেঙ্গী বাদ্যযন্ত্র লোকেদের কাছে বেশ আদৃত হয়।

সেতার বাদ্যযন্ত্রের মতো তোমার জানা অন্য বাদ্যযন্ত্রের নাম লেখো।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় পার্সী ভাষায় রাগদর্পণ অনুবাদ করা হয়েছিলো। এছাড়া আকবরের দরবারের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ তানসেন হিন্দুস্থানী সংগীতকে খুব জনপ্রিয় করেছিলেন।

তোমার জানা বিভিন্ন সংগীতজ্ঞের নাম লেখো।

সংগীতের বহুবিধ উন্নতির জন্যে গোয়ালিয়র, মালব্য, গুজরাত, কাশ্মীর ও অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। রাজা মানসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতের বিভিন্ন রাগ সকলের নিয়ম 'মান কৌতূহল' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো।

পারসিক-আরবী সংগীত কলা দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের সংগীতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এইসব মধ্যযুগীয় কীর্তি সংগীত রত্নাকরে বর্ণনা করা আছে।

রাগ চোঘির মতো সংগীতের বিভিন্ন রাগের নাম অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মিলনের ফলে উভয় ধর্মের লোকেদের মধ্যে উত্তম বোঝাপড়া হয়েছিলো। যার ফলে ভারতে সুফি ও ভক্তি ধর্মের প্রচার হয়ে বিভিন্ন প্রকার আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলার বিকাশ হয়েছিলো।

আমরা কি শিখলাম

- মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মিলনের ফলে উভয় ধর্মের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য সুফি ও ভক্তি ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো।
- ভক্তি ধর্মের প্রবক্তাগণের মধ্যে কবীর, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য, জ্ঞানেশ্বর, নামদেব ও তুকারাম অন্যতম।
- সুফি ধর্মের প্রচারকগণ হলেন নিজামউদ্দিন আউলিয়া, খাজামইনুদ্দিন চিস্তি, বাবা ফরিদ, শাহ আলম বুখারী প্রমুখ।
- সুফি ও ভক্তিধর্মের সারতত্ত্বগুলি আঞ্চলিক ভাষায় প্রচার করার ফলে তেলেগু, তামিল, কন্নড়, গুজরাটি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা হয়েছিলো।
- মধ্যযুগে সংগীত ও চিত্রকলার উন্নতি চরম সীমায় পৌঁছেছিলো।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:**

(ক) ভক্তি ও সুফি ধর্ম প্রচার হওয়ার কারণ কি?

(খ) ভক্তি আন্দোলনের সার কথা কি?

(গ) ভক্তি ধর্মের প্রচারকদের নাম লেখো।

(ঘ) সুফি ধর্ম কারা প্রচার করেছিলেন?

(ঙ) ভক্তি ও সুফি ধর্মের প্রচারের ফলাফল কি ছিলো?

(চ) মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ কেন হয়েছিলো?

(ছ) চিত্রকলার বিকাশ মধ্যযুগে কিভাবে হয়েছিলো?

(জ) সংগীত কলা বিকাশের জন্য মধ্যযুগে নেওয়া পদক্ষেপগুলি লেখো।

২. **নিচের প্রশ্নের কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যেগুলি ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।**

(ক) কবীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
বেনারস, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ।

(খ) শিখ ধর্ম কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
কবীর, গুরুনানক, গোবিন্দ সিং, তুকারাম।

(গ) শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য কে ছিলেন?
গোপদাস, মধুদাস, হরিদাস, গোবিন্দদাস।

(ঘ) নামদেব কোন রাজ্যের ধর্ম প্রচারক ছিলেন?
গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ু।

(ঙ) নিজামুদ্দিন আউলিয়া কোথায় বাস করতেন?
গিয়াসপুর, দিল্লী, গুরগাঁও, মথুরা।

(চ) মহাভারত ও রামায়ণ কে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন?
নসরত শাহ, মহম্মদ শাহ, অহম্মদ শাহ, হরিহর শাহ।

(ছ) আমুক্ত মাল্যব কোন ভাষায় লেখা হয়েছিলো?
তামিল, তেলেগু, বাংলা, মালায়ালাম।

(জ) তসবীর খানা কে নির্মাণ করেছিলেন?
জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আকবর, বাবর।

(ঝ) 'রাগ দর্পণ' কোন সুলতানের সময় লেখা হয়েছিলো?
বলবন্, বাবর, মহম্মদ-তুঘলক, ফিরোজ শাহ তুঘলক।

৩. **যেটা আলাদা তার চারপাশে গোল দাগ দাও।**

(ক) কবীর, গুরুনানক, শাহ আলম বুখারী, জ্ঞানেশ্বর।

(খ) বীজক, গুরুগ্রন্থ সাহেব, চৈতন্যচরিতামৃত, বাবা ফরিদ।

(গ) পদ্মাবতী, হিন্দী, তেলেগু, পাঞ্জাবী।

(ঘ) তবলা, ঢোলক, হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ।

৪. **'ক' স্তম্ভে দেওয়া নামের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের পুস্তককে দাগ দিয়ো জোড়ো।**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
গুরুনানক	মহাভারত
সারলা দাস	ভাগবত
জগন্নাথ দাস	দান্তি রামায়ণ
বলরাম দাস	আদি গ্রন্থ, রাগদর্পণ।

তোমার কাজ

বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকদের ফটো চিত্র সংগ্রহ করে তাঁদের বিষয়ে বিবরণী প্রস্তুত করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

মোগলরা ভারতবর্ষকে দুশোর বেশী বছর শাসন করেছিলেন। আকবরের উদার নীতি ও সুশাসনের দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পেরেছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ও কু-শাসন মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল ও পতনাভিমুখী করেছিলো।

> **জানো কি?**
> যে কোনো সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সেই দেশের শাসকের দক্ষতা ও চরিত্রের ওপরে নির্ভর করে।

কেন্দ্রশক্তির দুর্বলতা:

ঔরঙ্গজেবের পরে মোগল সাম্রাজ্যকে শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, পরবর্তী শাসকের ছিলো না। তারা সর্বদা ভোগ বিলাসে মজে থাকার কারণে তাদের নৈতিক অধোগতি ঘটেছিলো। আমীর এবং রাজ কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন করতে মোগল দরবারে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। ক্রমে সম্রাটরা তাঁদের চক্রান্তের শিকার হয়ে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের অধঃপতন ঘটলো। দিল্লীর পাশাপাশি অঞ্চল ছাড়াও সুদূর প্রদেশেও কেন্দ্র শক্তির কোনো কতৃত্ব রইলো না। মোগল দরবারে গোষ্ঠী কোন্দল কেন্দ্র শক্তিকে আরও দুর্বল করে দিল।

> আমাদের দেশের কেন্দ্র শক্তি দুর্বল হলে, কি কি অসুবিধে হবে, আলোচনা করে লেখো।

অর্থনৈতিক কারণ:

মোগল সম্রাট আকবর সুচিন্তিত শাসন প্রণালীর প্রবর্তন করে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি সুদৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকদের সময় শাসন প্রণালীর পরিবর্তন ঘটলো। জাহাঙ্গীরের শাসন কালে নুরজাহান নিজের হাতে শাসনকার্য্য চালাবার সময় অর্থনীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেন না। শাহাজাহানের সময় অনেক রাজপ্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণে বহু অর্থ খরচা হয়েছিলো। তাই তার রাজত্বে ভু-রাজস্য শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছিলো। এছাড়া মোগল সম্রাটরা শত্রুর কবল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ করার ফলে রাজ্যকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিলো। অর্থের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। এ সবের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ হওয়ার ফলে অর্থনীতি বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছেছিলো।

> **চিন্তা করো।**
> তুমি যদি মোগল সাম্রাজ্যের একজন রাজা হতে, অর্থনীতির সুষ্ঠ পরিবর্তন আনতে, কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে? চিন্তা করে লেখো।

ধর্মগত কারণ:

ঔরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষ নীতি মোগল সাম্রাজ্য পতনের অন্য এক কারণ। উঠে যাওয়া জিজিয়া ও অন্য তীর্থ যাত্রীকর সমূহ হিন্দুদের ওপর আবার বসিয়ে ছিলেন। হিন্দুদের রাজকার্য্য থেকে বহিষ্কার করেছিলো। শিখেদেরও তিনি কু-দৃষ্টিতে দেখতেন বলে তারাও তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছিলো।

চিন্তা করো।

ঔরঙ্গজেব কি করলে তাঁর ধর্মনীতি সব শ্রেণীর লোকেদের ভালো লাগতো। চিন্তা করে লেখো।

প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা:

মোগল শাসন দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন থেকে প্রদেশগুলি আস্তে আস্তে স্বাধীন হয়ে গেলো। দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বাংলা ক্রমে স্বাধীন হয়ে গেলো। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠারা দাক্ষিণাত্যে ক্রমশ ক্ষমতা বিস্তার করতে লাগলো। তারা আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার দুর্গগুলো আক্রমণ করে কিছু দুর্গ অধিকার করেছিলো। ফলে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুত্থান হলো ও মোগল সাম্রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো।

শিখ, রাজপুত, জাঠ ও রোহিলাগণ মোগলদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো। বাংলার শাসক, বাংলার সঙ্গে ওড়িশা ও বিহারকে নিয়ে এক বিরাট অঞ্চলের ওপর নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো। এই কারণের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের পতনের রাস্তা খুলে গিয়েছিলো।

মোগল শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন কোন প্রাদেশিক শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, তার এক তালিকা প্রস্তুত করো।

বৈদেশিক শত্রু আক্রমণ:

পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিলেন। তিনি শাহাজাহানের বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন ও হীরে কোহিনূর ভারত থেকে পারস্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই আক্রমণের ফলে সিন্ধুপ্রদেশ, লাহোর, কাবুল প্রভৃতি অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যে মিশে গেলো।

নাদির শাহর পরে আফগানিস্তানের শাসক আহম্মদ শাহ আবদালী ১৭৪৮ থেকে ১৭৬১ সালের মধ্যে অনেকবার ভারত আক্রমণ করেছিলো। ১৭৬১ সালেআহম্মদ শাহ আবদালী তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠাদের পরাস্ত করেছিলো।

নাদির শাহ

আহম্মদ শাহ আবদালী

ইউরোপীয় বণিকরাও মোগল সাম্রাজ্যের দুরবস্থার সুযোগ নিয়েছিলো। পর্তুগীজদের পরে ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের বাণিজ্য কোম্পানী নিয়ে ভারতে এসেছিলো। তাদের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠলো। শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজরা অধিক শক্তিশালী হয়ে ভারতে রাজ্য বিস্তার করেছিলো ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিলো।

চিন্তা করো:
ভারতকে বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক শত্রুরা আক্রমণ করার পেছনে কি কারণ আছে?

আমরা কি শিখলাম

- কেন্দ্র শক্তির দুর্বলতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে ধর্ম বিদ্বেষের নীতি প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা ইত্যাদি কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিলো।
- নাদির শাহ ভারত থেকে শাহাজানের প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন ও কোহ-ই-নূর হীরে নিয়ে গিয়েছিলেন।
- আহম্মদ শাহ আবদালী তৃতীয় পানিপথে যুদ্ধে মারাঠাদের পরাস্ত করেছিলেন।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:**

(ক) কেন্দ্রশক্তির দুর্বলতা কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলো লেখো।

(খ) ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কিভাবে দায়ী ছিলো লেখো।

(গ) কোন কোন প্রাদেশিক শক্তিদের স্বাধীনতা ঘোষণা, মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলো।

(ঘ) বৈদেশিক শত্রুদের আক্রমণ কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী উল্লেখ করো।

২. বন্ধনীর ভেতর থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) কার ধর্মনীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিলো?

(বাবর, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব, শাহাজাহান)

(খ) কে ভারত থেকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে গিয়েছিলেন?

(বৈরাম খাঁ, শিবাজী, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালী)

(গ) কোন বিদেশী আক্রমণকারী মারাঠাদের তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন?

(তৈমুর লঙ, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালী, রবার্ট ক্লাইভ)

(ঘ) কোন খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিলেন?

(১৫৪২, ১৭৩৯, ১৭৪৮, ১৭৬১)

(ঙ) তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ কোন খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিলো?

(১৭৪১, ১৭৫১, ১৭৫৭, ১৭৬১)

৩. মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অর্থনৈতিক ও ধর্মগত কারণের মধ্যে তুমি কোনটাকে বেশী প্রাধান্য দেবে এবং কেন?

৪. মারাঠা ও বাংলার শাসকের মধ্যে কে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বেশী দায়ী ছিলেন, প্রমাণ দিয়ে লেখো।

৫. কোন বিদেশী আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি ঘটিয়েছিলো, কেন?

তোমার কাজ

মোগল সম্রাটদের চিত্রসংগ্রহ করে তাদের প্রধান কার্য্যাবলীর কথা উল্লেখ করো।

সপ্তম অধ্যায়

ওড়িশায় সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ

গঙ্গবংশের পতনের পরে ওড়িশার নতুন এক রাজবংশের অভ্যুদয় হয়েছিলো। এই বংশ সূর্য্যবংশ নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশের রাজারা 'গজপতি' উপাধিতে ভূষিত হতেন। সূর্য্যবংশী রাজাদের রাজত্বকালে ওড়িশার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিলো।

কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

কপিলেন্দ্র দেব সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গঙ্গবংশের শেষ রাজা চতুর্থ ভানুদেবের সেনাপতি ছিলেন। ভানুদেব নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁর মৃত্যুর পরে নিজশক্তি বলে এবং মন্ত্রী-সান্ত্রীদের সমর্থন হাসিল করে ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কপিলেন্দ্র দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই বছরেই তিনি 'কপিলাব্দ' প্রচল করেছিলেন।

রাজ্যজয়:

কপিলেন্দ্র দেব একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। তিনি গৌড়ের সুলতানকে পরাজিত করে গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্যজয় করে কর্ণাট অঞ্চল অধিকার করে নবকোটি কর্ণাট উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি বাহমনীর সুলতানকে পরাস্ত করে কলবর্গ (বর্তমানের কর্ণাটকের গুলবর্গা) অধিকার করে 'কলবর্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরে গঙ্গানদী থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তিনি নিজেকে 'গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তুমি জানো কি?

সম্রাট কপিলেন্দ্র দেবের উপাধি ছিলো 'গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর' কপিলেন্দ্র দেব বিশাল গজ (হাতী) সেনার অধিপতি বলে তিনি 'গজপতি' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি গৌড়ের (বঙ্গ) কিছু অংশ দখল করে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি পান। তিনি কর্ণাট অঞ্চল তথা বাহমনী রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কলবর্গ (গুলবর্গা) জয় করায় 'নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

তোমাদের অঞ্চলে আগের কালে বিশিষ্ট লোকেদের কি কি উপাধি দেওয়া হতো; অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

রাজ্যশাসন ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ:

একজন সুশাসকরূপে কপিলেন্দ্র দেব ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি রাজ্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন প্রজাবৎসল সম্রাট ছিলেন। তিনি রাজ্যময় যাত্রা করে প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন এবং বিভিন্ন সমস্যার কথা সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রজাদের থেকে লবণ ও কড়ির খাজনা তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের ধন জীবন নিরাপদ ছিলো। তারা সুখ শান্তিতে বাস করতো। সে সময় রাজ্যের আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো. যা কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে সম্ভবপর হয়েছিলো।

কপিলেন্দ্র দেবের সময় তুমি তার প্রজা হলে কি কি বেশী সুবিধের জন্য রাজাকে অনুরোধ করতে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

কপিলেন্দ্র দেব কলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভুবনেশ্বরের কাছে কপিলেশ্বর শিব মন্দির তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিলো। তিনি 'কপিলেশ্বর পুর' ও 'দামোদর পুর' নামে দুটি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি পরশুরাম বিজয় নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর সময়ে নৃসিংহ বাজপেয়ী সংস্কৃতে সংক্ষেপ শারীরিক বর্তিকা নামক এক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে শুদ্রমনি সারলা দাস ওড়িয়া ভাষায় 'মহাভারত' ও 'চণ্ডী পুরাণ' রচনা করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে শাসনকার্য্য তদারকের সময় কৃষ্ণা নদীর তীরে ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কপিলেন্দ্র দেবের মৃত্যু হয়।

তুমি জানো কি?

❖ শাসন—কেবল ব্রাহ্মণদের বসবাস করা গ্রামকে বলা হয়। অতীতে ওড়িশার রাজারা ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

❖ হাম্বীর ---তিনি ছিলেন কপিলেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দাক্ষিণাত্য বিজয়ে তিনি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। কপিলেন্দ্র দেব মৃত্যুর পুর্বে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম দেবকে ওড়িশার রাজারূপে ঘোষণা করায়, তাঁর মৃত্যুর পর হাম্বীর পুরুষোত্তম দেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছিলো।

'পর্শুরাম বিজয়' এর মতো অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যগুলির নাম সংগ্রহ করে সেগুলোর রচয়িতার নাম লেখো।

পুরুষোত্তম দেব: (১৪৬৭-১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)

পুরুষোত্তম দেব ছিলেন কপিলেন্দ্র দেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই সময় তিনি কপিলেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাম্বীরের সঙ্গে ভ্রাতৃ বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। এর সুযোগ নিয়ে শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

তুমি জানো কি?

❖ কাঞ্চি অধিকার — পুরুষোত্তম দেবের কাঞ্চি অধিকার করার কথা ওড়িশার এক প্রাচীন কিংবদন্তী। তিনি পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চিপুরম অধিকার করেননি। তিনি উদয়গিরি রাজ্য অধিকার করেছিলেন, যা কিংবদন্তীতে কাঞ্চিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজ্যজয়:

কপিলেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পরে সুযোগ পেয়ে উদয়গিরি রাজ্যের রাজা সাল্ব নরসিংহ দক্ষিণে ওড়িশার কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেছিলেন। পুরুষোত্তম দেব বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাল্ব নরসিংহ দেবকে পরাস্ত করে উদয়গিরি রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিলেন। সাল্ব নরসিংহ দেব পুরুষোত্তম দেবের সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং নিজের কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

❖ কাঞ্চি অভিযান সম্পর্কে নিম্নলিখিত শব্দ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি গল্প রচনা করো।

❖ জগন্নাথ, সাদা-কালো ঘোড়া, গোয়ালিনী, পুরুষোত্তম দেব, সাল্ব নরসিংহ দেব, পদ্মাবতী, চণ্ডাল, চতুর মন্ত্রী, রথযাত্রা, পুরুষোত্তম দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ।

বাহমনীর সুলতান, রাজমহেন্দ্রী অধিকার করে নিয়েছিলেন। পুরুষোত্তম দেব বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করে রাজমহেন্দ্রী সমেত গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করে গজপতি সাম্রাজ্যে মিলিত করে ছিলেন।

রাজ্য শাসন ও অন্যান্য কীর্তি:

পুরুষোত্তম দেব একজন ধর্মপ্রাণ, প্রজাবৎসল ও সুশাসকরূপে বিখ্যাত। তিনি ১৬টি ব্রাহ্মণ শাসন স্থাপন করেছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। তিনি অভিনব গীত গোবিন্দ রচনা করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

পুরুষোত্তম দেব ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পুরুষোত্তম দেব একজন সফল শাসক ছিলেন কি? সপক্ষে/বিপক্ষে নিজের মতামত প্রকাশ করো।

প্রতাপরুদ্র দেব: (১৪৯৭-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রতাপরুদ্র দেব ছিলেন সূর্য্যবংশের শেষ সম্রাট। পুরুষোত্তম দেবের পরে তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্র দেব ১৪৯৭ সালে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসন আরোহণ করার পর ওড়িশা ঘনঘন বহিঃশত্রুদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো। এই আক্রমণ গজপতির সাম্রাজ্যের পতনের পথ পরিষ্কার করে দিলো।

শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ:

প্রতাপরুদ্র দেব দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরে যুদ্ধরত থাকার সময় বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহর সৈন্যরা ওড়িশা আক্রমণ করে পুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো। এই সংবাদ পেয়ে প্রতাপরুদ্র দেব তাড়াতাড়ি দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে শত্রু সৈন্যদের তাড়িয়ে দিলেন।

প্রতাপরুদ্র দেব দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন না করলে কি হতো বলে তুমি ভাবছো লেখো।

সেই সময় বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় প্রবল প্রতাপী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উদয়গিরি সমেত ওড়িশার বহু অঞ্চল অধিকার করে সীমাচলম পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রতাপরুদ্র দেব তার গতিরোধ করে পরাজিত হলেন। তিনি কৃষ্ণদেবের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁকে গোদাবরীর দক্ষিণে থাকা ওড়িশার অঞ্চল ছেড়ে দিলেন এবং নিজের কন্যা জগন্মোহিনীর সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। এই সব আক্রমণের ফলে গজপতি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লো।

যদি প্রতাপরুদ্র দেব কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে সন্ধি না করতেন, তা হলে কি সব অসুবিধে হতো, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

তুমি জানো কি?

বীর ভদ্র—তিনি প্রতাপরুদ্র দেবের একমাত্র পুত্র। দাক্ষিণাত্যের কোণ্ডা ভিডু দুর্গ অধিকার করার সময় বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন। অসি চালনায় তিনি ছিলেন ভীষণ দক্ষ। কৃষ্ণদেবের দরবারে একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করতে বলায়, খুব অপমানিত হয়ে তরোয়াল নিজের বুকে বিদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এই ঘটনা প্রতাপরুদ্রকে বড় দুর্বল করে দিয়েছিলো।

কলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা:

প্রতাপরুদ্র দেব একজন প্রজাবৎসল সম্রাট ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি ও বিদ্বান ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত 'সরস্বতী বিলাস' হিন্দু আইনের এক অমূল্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত। সেই সময় জগন্নাথ দাস মহাভারত ও বলরাম দাস ওড়িয়া ভাষায় দাণ্ডি রামায়ণ লিখেছিলেন। কবি জীবদেব আচার্য্য 'ভক্তি ভাগবত' রচনা করেছিলো। রায় রামানন্দ 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করেছিলেন। বহু কবি ও পণ্ডিত প্রতাপরুদ্র দেবের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

তুমি জানো কি ?

পঞ্চসখা—তাঁরা হলেন বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, অচ্যুতানন্দ দাস এবং যশোবন্ত দাস। এঁরা প্রতাপরুদ্র দেবের সমসাময়িক ছিলেন। এঁদের রচিত গ্রন্থ সকল ওড়িয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

প্রতাপরুদ্র দেবের সময়ে পঞ্চসখার আবির্ভাব হয়েছিলো। তাদের মধ্যে জগন্নাথ দাস ও বলরাম দাসের পুস্তকের সূচনা দেওয়া হয়েছে। অন্যদের পুস্তকের সম্পর্কে বড়দের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

প্রতাপরুদ্র দেব পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে মুক্তি মণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি কটকের কাছে ধবলেশ্বর মন্দির ও ঢেঙ্কানালের কপিলাস পর্বতের ওপর চন্দ্রশেখর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রতাপরুদ্র দেব শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতাপরুদ্র দেবের সময় ঘটে যাওয়া বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে কোনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কেন লেখো।

মুকুন্দ হরিচন্দন:

প্রতাপরুদ্র দেবের পরে তাঁর মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর ষড়যন্ত্র করে রাজা হয়েছিলেন। তিনি ভোই বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের পরে তাঁর পুত্র চক্র প্রতাপ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরে মুকুন্দ হরিচন্দন (১৫৬০-১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন ওড়িশার শেষ স্বাধীন রাজা। রাজা বলা হয়। তিনি কটকের বারবাটী দুর্গের মধ্যে নবতল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

তুমি জানো কি ?

তেলেগু মুকুন্দ—গজপতি সাম্রাজ্যের রাজ মহেন্দ্রী অঞ্চলে রাজত্ব করা চালুক্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্য তিনি ওড়িশা ইতিহাসে তেলেগু মুকুন্দ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রতাপরুদ্রের সৈন্য বাহিনীতে একজন সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের রাজত্বকালে তিনি কটক শহরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মুকুন্দ হরিচন্দন ও মুকুন্দ দেব নামেও ওড়িশার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

বারবাটী দুর্গ

সাম্রাজ্য বিস্তার:

মুকুন্দ হরিচন্দন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশার সিংহাসনে আরোহণ করে মুকুন্দ দেব নামে খ্যাত হলেন। ওড়িশার আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বঙ্গের সুলতান গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশা আক্রমণ করে জাজপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। মুকুন্দ দেব গিয়াসুদ্দিনকে পরাস্ত করে ওড়িশা সাম্রাজ্যের সীমা গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বিজয়ের স্মৃতি স্বরূপ তিনি হুগলি জেলায় গঙ্গা নদীর কূলে ত্রিবেণীঘাট নির্মাণ করেছিলেন।

যুদ্ধ এবং বিপর্য্যয়:

মোগল সম্রাট আকবর বঙ্গ দেশ জয় করার জন্য মুকুন্দ দেবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এতে বঙ্গের সুলতান সুলেমান কররানী ক্ষুব্ধ হয়েছিলো।১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করে ওড়িশা আক্রমণ করেছিলেন। সুলেমান কররানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মুকুন্দ দেব পরাজিত হয়েছিলেন। কররানীর অন্য এক সৈন্যদল তাঁর পুত্র বায়জিদ এবং সেনাপতি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়ে কটক অধিকার করেছিলেন।

এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সারঙ্গগড়ের সামন্তরাজা রামচন্দ্র ভঞ্জ মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে গজপতি রাজারূপে ঘোষণা করলেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে গঙ্গানদী থেকে ফেরার সময় রামচন্দ্রের সঙ্গে জাজপুরের কাছে গোহিরী টিকিরায় ১৫৬৮ সালে মুকুন্দদেবের যুদ্ধ হয়েছিলো। এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব নিহত হলেন। মুকুন্দদেবের পরে ওড়িশার স্বাধীনতা লোপ পেলো।

কালা পাহাড়ের সম্পর্কে কিংবদন্তীর বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

আমরা কি শিখলাম

- সূর্য্যবংশী রাজা কপিলেন্দ্র দেব 'গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।
- পুরুষোত্তম দেব দাক্ষিণাত্যের উদয়গিরি রাজ্য অধিকার করেছিলেন।
- প্রতাপ রুদ্রদেব সূর্য্যবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন।
- মুকুন্দ হরিচন্দন ওড়িশার শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন।

প্রশ্নাবলী

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

(ক) কপিলেন্দ্র দেবের রাজ্যজয়ের বিবরণ দাও।

(খ) প্রতাপ রুদ্রদেব এবং কৃষ্ণদেব রায়ের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে লেখো।

(গ) প্রতাপ রুদ্রদেবের সময় সৃষ্টি হওয়া সাহিত্য সম্পর্কে সূচনা দাও।

(ঘ) মুকুন্দ হরিচন্দন এবং সুলেমান কররানীর মধ্যে হওয়া যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিলো।

২. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) ——— সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(মুকুন্দ দেব, কপিলেন্দ্র দেব, পুরুষোত্তম দেব, প্রতাপরুদ্র দেব)

(বাবর, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব, শাহাজাহান)

(খ) চণ্ডিপুরাণ ——— রচনা করেছিলেন

(বলরাম দাস, অনন্ত দাস, সারলা দাস, জগন্নাথ দাস)

(গ) ——— কপিলেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

(পুরুষোত্তম দেব, প্রতাপরুদ্র দেব, হাম্বীর, সাল্ব নরসিংহ)

(ঘ) অভিনব গীতগোবিন্দের রচয়িতা ———।

(প্রতাপরুদ্র দেব, কবিচন্দ্র রায় দিবাকর, পুরুষোত্তম দেব, সারলা দাস)

(ঙ) ——— ওড়িশার শেষ স্বাধীন রাজা।

(প্রতাপরুদ্র দেব, গোবিন্দ বিদ্যাধর, কপিলেন্দ্র দেব, মুকুন্দ হরিচন্দন)

৩. 'ক' স্তম্ভের খ্রীষ্টাব্দকে 'খ' স্তম্ভে ঘটনাকে দাগ টেনে জোড়ো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ	কপিলেন্দ্র দেবের সিংহাসনে আরোহণ।
১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ	মুকুন্দ হরিচন্দন সিংহাসনে আরোহণ।
১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ	পুরুষোত্তম দেবের মৃত্যু।
১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ	প্রতাপরুদ্র দেবের মৃত্যু।

৪. সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো।

কপিলাব্দ, সাল্ব নরসিংহ, কৃষ্ণদেব রায়, হুসেন শাহ, প্রতাপরুদ্র দেবের সাহিত্য অনুরাগ, গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহ, গোহিরী টিকিরা।

৫. রেখাঙ্কিত পদগুলি পরিবর্তন না করে ভ্রম সংশোধন করো।

(ক) পুরষোত্তম দেব 'গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কল বর্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

(খ) রায় রামানন্দ কপিলেশ্বর দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

(গ) 'চণ্ডিপুরাণ' এবং ওড়িয়া 'মহাভারত' বলরাম দাস রচনা করেছিলেন।

(ঘ) প্রতাপরুদ্র দেব গঙ্গানদীর কূলে ত্রিবেণীঘাট নির্মাণ করেছিলেন।

৬. কপিলেন্দ্র দেবের 'গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার কারণ কি ?

৭. ওড়িশায় সূর্য্যবংশী নরপতিদের সময়ে রচিত হওয়া সাহিত্যকৃতিগুলোর তালিকা প্রস্তুত করো।

৮. মুকুন্দ হরিচন্দনকে কেন ওড়িশার শেষ স্বাধীন রাজা বলা হয় ?

৯. ওড়িয়া সাহিত্য কপিলেন্দ্র দেব বা প্রতাপ রুদ্র দেবের সময় বেশী বিকশিত হয়েছিলো ? প্রমাণ দিয়ে লেখো।

তোমার কাজ

বারবাটী দুর্গের চিত্র সংগ্রহ করে রং দিয়ে বিবরণী লেখো।

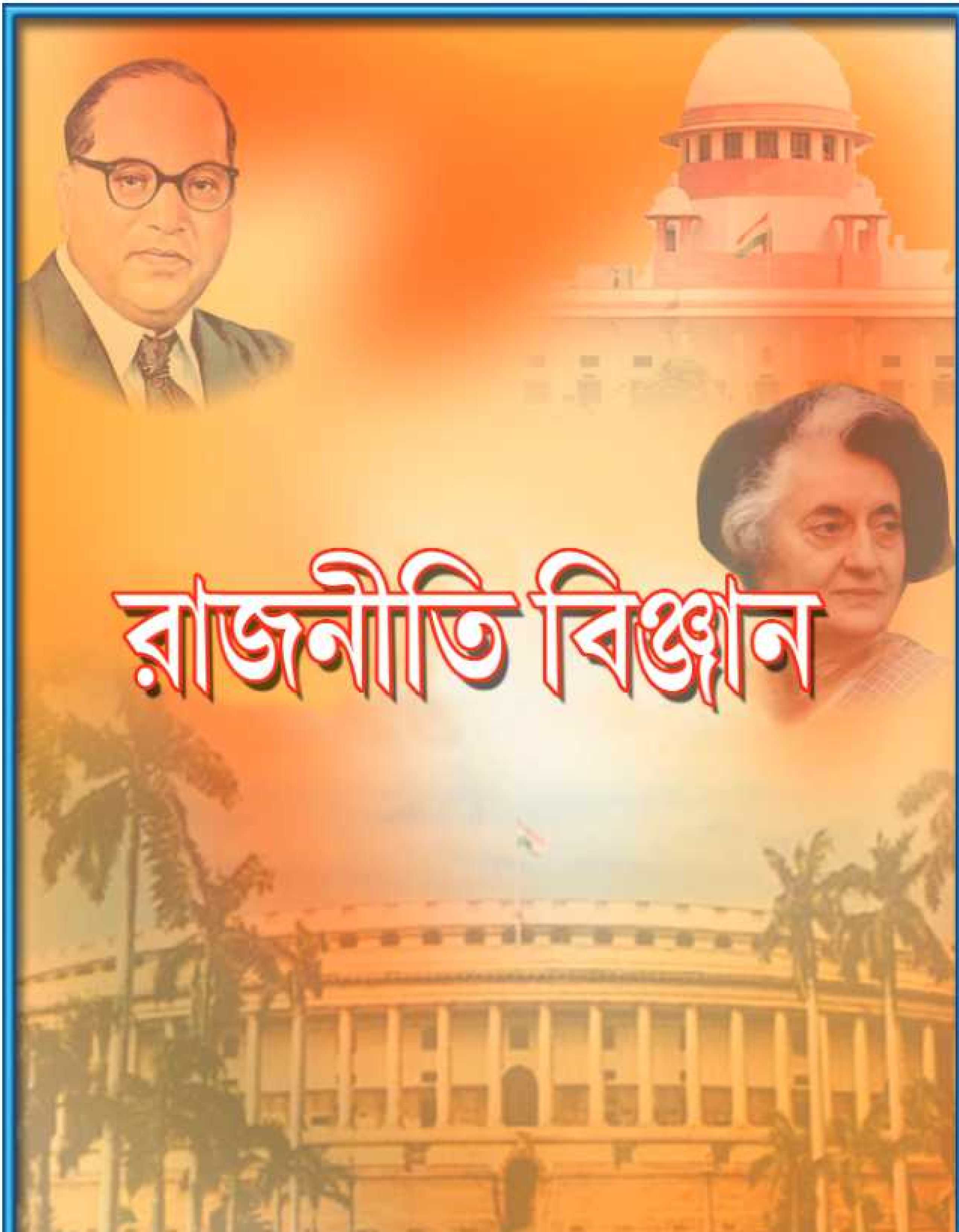
রাজনীতি বিজ্ঞান

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা ভারতবাসী ভারতকে এক সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গঠন করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও ইহার নাগরিকদের

- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় ;
- চিন্তা, অভিব্যক্তি, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বতন্ত্রতা।
- স্থিতি ও সুবিধা সুযোগের সমানাধিকরণের সুরক্ষা প্রদান করা তথা ;
- ব্যক্তি মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব উৎসাহিত করার লক্ষ্যে

এই ১৯৪৯ সালের নভেম্বর ২৬ তারিখে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন সভায় এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ ও প্রণয়ন করেছি এবং তা' রক্ষার্থে আমরা নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রথম অধ্যায়

সংবিধান
(CONSTITUTION)

শহর বাজারে পুজো পার্বণে যাতায়াতের সময় লোকেদের ভিড় থেকে রক্ষা করার জন্যে শহরে জনসাধারণ ও গাড়িমোটরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজন হয়।

সেই রকম আরও একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিতে নদী পাড় টপকে গ্রাম বসতি ভাসিয়ে নেয়। কিন্তু যদি একটা বাঁধ দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নদীর প্রখর স্রোত সহজে পাড় টপকে যেতে পারে না এবং জনসাধারণের অসুবিধে দূর হওয়ার সাথে সাথে বাঁধ জলকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে।

পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে জনসাধারণের যেমন সাহায্য করে, বাঁধ যেভাবে উত্তাল নদীর প্রখর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক সেইভাবে দেশের সংবিধান, দেশের জন সাধারণকে শৃঙ্খলিত করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। সরকারের উপর দায়িত্ব বাড়ায়।

সংবিধান কি ?

সংবিধান বলতে আমরা কি বুঝি ? সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। এই মৌলিক আইনের দ্বারা সরকার গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার সরকারে (সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতিত্ব সরকার, ঐকিক রাষ্ট্র, সংসদীয় রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র) সার্বভৌম ক্ষমতার সুনিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টন করা হয়। বিনা সংবিধানে অধুনা কোনো রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা যেতে পারে না। বিশেষত একটি সংসদীয় রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ও তাদের বিবাদের সমাধান করার ব্যবস্থা থাকে। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্যান্য আইনগুলো সংবিধানের মান্যতা পায়।

তুমি জানো কি ?

ফাইনারের মতে:

সংবিধান মৌলিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের এক ব্যবস্থা।

উলসের মতে (Woolsey):

সংবিধান হচ্ছে নীতির সমাহার। যার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগরিকদের অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের সমন্বয় ঘটে থাকে।

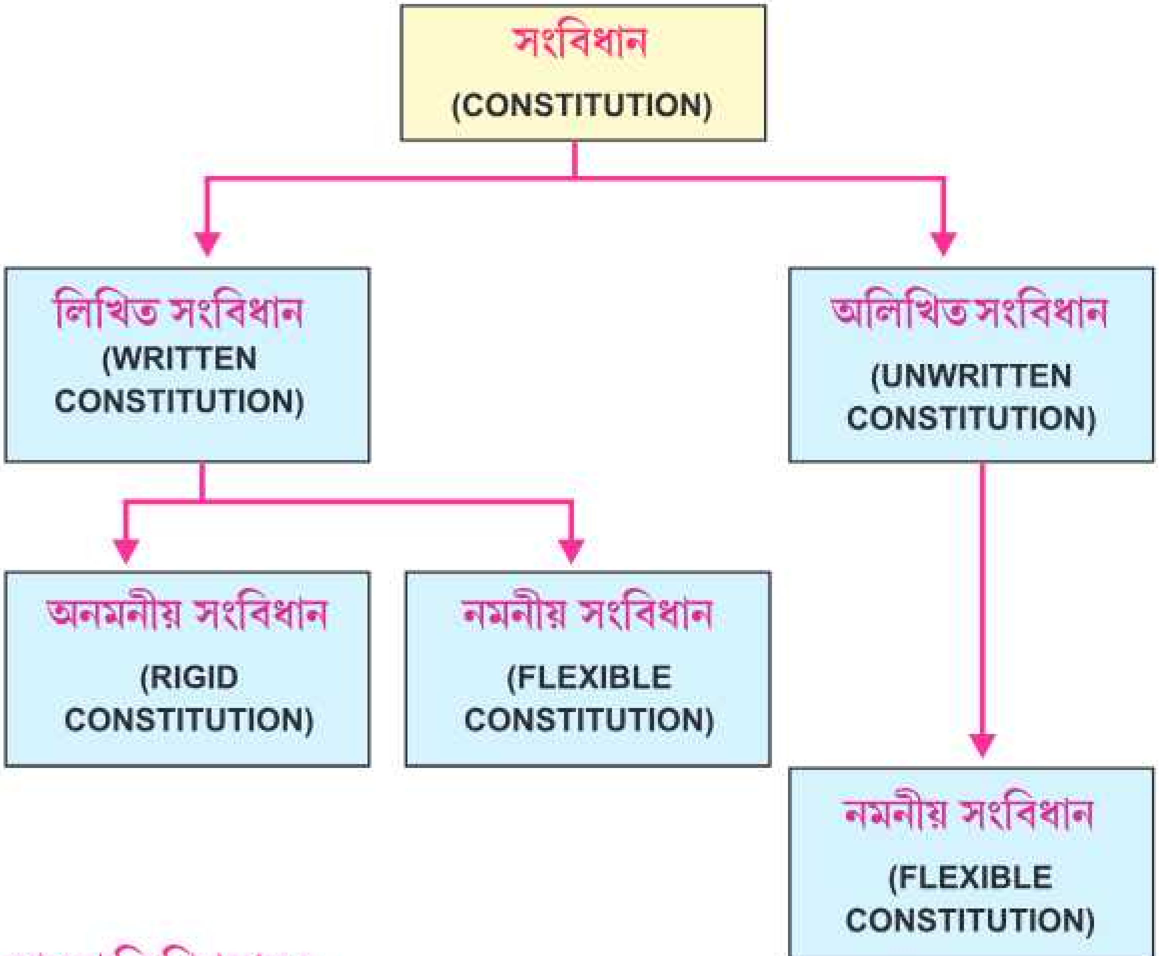

আমরা কি শিখলাম ?

সংবিধান বলতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়কে বুঝি:

(ক) সরকার গঠন ও ক্ষমতা।

(খ) দেশের সুপরিচালনার নিয়ম ও বিধি।

(গ) জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক।

(ঘ) জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্যের বিবরণী এবং সুরক্ষা।

সংবিধান প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(১) ক্রম বিকশিত সংবিধান

(২) সংবিধান প্রণয়ন সভার দ্বারা প্রণীত সংবিধান

১. ক্রম বিকশিত সংবিধান:

এই সংবিধান কেউ প্রণয়ন করেন না। এটি আপনা আপনি ঘটনাচক্রে ঐতিহাসিক।

তুমি জানো কি?

❖ সরল অর্থে সংবিধান বললে কেবল লিখিত সংবিধানকে বোঝায় যাতে সরকারের ক্ষমতা, সংগঠন, জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্ক, জনসাধারণের অধিকার, কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে লিখিত সাংবিধানিক নীতির সঙ্গে অলিখিত প্রথা, পরম্পরা ও চালচলন, যার দ্বারা রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারের ক্ষমতা কার্য্যকারী হয় তাকে বোঝায়।

❖ ব্রিটেনের সংবিধান 'বিকশিত সংবিধান'-এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

বিবর্তন, ক্রমবিকশিত রাজনৈতিক প্রয়োজনীতায় বিকাশ লাভ করে থাকে। এই ধরনের সংবিধান সামাজিক আচরণ চালচলন প্রথা এবং পরম্পরার ওপর পর্য্যবসিত।

তোমার সমাজের বিভিন্ন প্রথার উদাহরণ দাও

২. সংবিধান প্রণয়ন সভার দ্বারা প্রণীত সংবিধান:

জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন সভা করে উক্ত সভা কিংবা অন্য কোনো ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থার দ্বারা সংবিধানকে লিখিত দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ হলে একে লিখিত সংবিধান বলা হয়। এই সংবিধানের কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

তুমি জানো কি?

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা, ভারত, ফ্রান্স প্রভৃতির সংবিধান হচ্ছে লিখিত সংবিধানের উদাহরণ।

কোন কোন পরিস্থিতিতে লিখিত দলিল এবং সংবিধানের আবশ্যকতা পড়ে? অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

লিখিত সংবিধান (Written Constitution)

লিখিত সংবিধান একটি দেশের সংবিধানিক আইন। যেটা সেই দেশের সরকার এবং জনসাধারণ মানতে বাধ্য। এই সংবিধানে, সরকারের সংগঠন বিভিন্ন শাখার মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, নাগরিকদের অধিকার এবং সুরক্ষা ও সরকার এবং নাগরিক মধ্যে সম্পর্কের প্রকাশ ও বর্ণনা করা হয়। এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন।

তুমি জানো কি?

গার্ণারের মতে,

লিখিত সংবিধান এক সুচিন্তিত যোজনা যা যত্ন সহকারে সংবিধান প্রণয়ন সভা কিংবা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত সভার দ্বারা প্রণয়ন ও অনুমোদন লাভ করে থাকে।

ভারতের সংবিধানকে আইনজীবীদের ভূস্বর্গ বলা হয়।(Lawyer's Paradise)

ভারতীয় সংবিধানকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান (৩৯৫ ধারা বিশিষ্ট) রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বের কোন কোন দেশের সংবিধান লিখিত, সেই রকম দুটি দেশের নাম, তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

কোনো কোনো সংবিধানবিদ মত প্রকাশ করেন যে দেশের ভবিষ্যৎকে নজরে না রেখে লিখিত সংবিধান প্রস্তুত করার অর্থ, একজন দরজীর এক ব্যক্তির ভবিষ্যতের শরীর বিকাশ নজরে না রেখে কেবল বর্তমানের শরীরের মাপে পোষাক তৈরী করার সঙ্গে সমান।

তুমি জানো কি ?

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সংবিধান বিশ্বের সর্বপ্রাচীন লিখিত সংবিধান। এটা ১৭৮৯ সাল থেকে কার্য্যকরী হয়েছে।

১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতে জন প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান সভা তৈরী হয়েছিলো। উক্ত সভা ১৯৪৯ সালের নভেম্বর ২৬ তারিখ সংবিধান গঠন কার্য্য সমাপ্ত করেন এবং ১৯৫০ সালের জানুয়ারি ২৬ তারিখ থেকে এই লিখিত সংবিধান কার্য্যকরী হলো।

দু-দলের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সময় যদি কোনো কারণে রেফারীর নিষ্পত্তি নেওয়ার ফলে একদল সন্তুষ্ট না হয় তাহলে রেফারী কি করবেন?

অলিখিত সংবিধান (UnWritten Constitution)

অলিখিত সংবিধান প্রণয়ন সভা দ্বারা প্রস্তুত হয় না বা কোনো লিখিত পুস্তক বা দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় না। এর উৎপত্তি প্রধানত: প্রথা, পরম্পরা, চালচলন এর ওপর নির্ভর হয়ে থাকে এবং ক্ষমতা কয়েকটি নির্দিষ্ট লিখিত আইন এবং প্রথার দ্বারা পরিচালিত হয়।

একটি লিখিত সংবিধানেও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা লিখিতভাবে থাকে না। এমনকি আমেরিকা ও ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান হলেও এই সংবিধানে অনেক প্রথা, সামাজিক আচরণ পরম্পরা আছে, যা অলিখিত এবং যাকে উক্ত লিখিত সংবিধানের এক প্রধান অংশরূপে গ্রহণ করা হয়।

তুমি জানো কি ?

বিশ্বের কোনো সংবিধান সম্পূর্ণ অলিখিত নয়। এমনকি ১২১৫ মার্গাকার্টা, ১৬২৮-পিটিসন অফ্ রাইট্‌স, ১৯১১-পার্লামেন্টারী অ্যাক্ট ইত্যাদিকে ব্রিটিশ সংবিধানিক দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সংবিধানের উদাহরণ।

গার্ণারের মতে এক অলিখিত সংবিধানে অধিকাংশ আইন অলিখিত কিন্তু সমস্ত আইন অলিখিত নয়।

একটি লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে কোনটা তোমার মতে উৎকৃষ্ট এবং কেন?

তুমি জানো কি?
ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাছা, সংবিধানে লিপিবদ্ধ না হলেও এটা একটা প্রথা ও পরম্পরার উদাহরণ।

অনমনীয় সংবিধান (Rigid Constitution):

যে সংবিধানকে সহজে সংশোধন এবং পরিবর্তন করতে পারা যায় না তাকে অনমনীয় সংবিধান বলা হয়। এর সংশোধন প্রক্রিয়া কষ্টসাধ্য। এতে নমনীয় সংবিধানের মতো সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) ও সাধারণ আইনের (Ordinary Law) পরিবর্তন বা সংশোধন একই শ্রেণীর বলে পরিগণিত হয় না। এতে সাংবিধানিক আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া সাধারণ আইনের সংশোধন প্রণালীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাংবিধানিক আইন সংবিধানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করা যেতে পারবে। ব্যবস্থাপক সভা যখন তখন এবং যে কোনো উপায়ে চাইলে এর সংশোধন করতে পারবে না। সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি সংবিধানে উল্লিখিত থাকে। সংবিধানে থাকা ব্যবস্থাগুলো সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত।

তুমি জানো কি?
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান একটি অনমনীয় সংবিধান।

ভারতের সংবিধানে ৩৬৮ ধারায় সংবিধান সংশোধন প্রণালী ব্যাখ্যা করা আছে। ভারতের সংবিধান অনমনীয় সংবিধান হলেও কেন্দ্র সংসদ কিছু ব্যবস্থায় সহজে সংশোধন আনতে পারে, যথা: নতুন রাজ্য গঠন, নাগরিকদের জন্য আইন, রাজ্য বিধান পরিষদের সৃষ্টি এবং উচ্ছেদ ইত্যাদি।

একটি অনমনীয় সংবিধানে সংবিধানের ব্যাখ্যা ও তর্জমা ন্যায়ালয়ের নিষ্পত্তির ওপর নির্ভর করে।

নমনীয় সংবিধান (Flexible Constitution):

সংবিধানের সংশোধন প্রণালী অনুসারে সংবিধানকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হতে পারে যথা—অনমনীয় (Rigid) এবং নমনীয় (Flexible) সংবিধান।

তুমি জানো কি?
ব্রিটিশ সংবিধান এক নমনীয় সংবিধানের জ্বলন্ত উদাহরণ।

একটি নমনীয় সংবিধানের সংশোধন প্রক্রিয়া খুব সহজ। অন্য অর্থে বললে যে সংবিধানে সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) ও সাধারণ আইনের (Ordinary Law) সংশোধন প্রণালীতে কোনো পার্থক্য থাকে না, তাকে নমনীয় সংবিধান বলা হয়। ব্যবস্থাপক সভা সাধারণত সংবিধান সংশোধন করে থাকে।

একটা কাঠ ও একটা বেলুনের মধ্যে কোনটা অনমনীয় এবং কোনটা নমনীয় বলো।

নমনীয় সংবিধান রাস্তার ওপরে লটকে থাকা কোমল লতার মতো। যে কোনো যান রাস্তায় যাওয়া আসা করার সময় কোমল লতাটি সরিয়ে দিলে যানটি সেই রাস্তায় চলে যাওয়ার পর কোমল লতাটি তার পুনঃস্থিতিতে যেমন ফিরে আসে সেই রকম নমনীয় সংবিধান এর আকৃতি নষ্ট না করে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে।

নমনীয় সংবিধান সংসদীয় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী নয়। সংসদীয় রাষ্ট্রের জন্যে লিখিত ও অনমনীয় সংবিধান আবশ্যক। নমনীয় সংবিধান পরিবর্তনশীল হওয়ার জন্যে দেশের শাসনক্ষেত্রে স্থিরতা আনতে পারে না। সংসদের শাসক দলের মনমুখী শাসনকে প্রশ্রয় দেয়।

একটি অনমনীয় ও নমনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

সংবিধানের আবশ্যকতা (Need of Constitution)

সংবিধান গণতন্ত্রের মূলভিত্তি বললে অত্যুক্তি হবে না সংবিধানের আবশ্যকতা নিম্নে দেওয়া হলো।

১. সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।
২. সরকারের কাজের সম্পর্কে সূচনা দেয়।
৩. জনসাধারণকে সুনাগরিক করার সুযোগ প্রদান করে।
৪. বর্তমানের ও ভবিষ্যতের বংশধরদের বিভিন্ন কার্য্যকলাপকে শৃঙ্খলিত করার জন্যে সংবিধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।
৫. সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা সংবিধানের দ্বারা হয়।

তুমি জানো কি ?

সংবিধানবিদরা মত পোষণ করেন যে একটি দেশের সংবিধান একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরী হওয়া প্রয়োজন। কারণ নতুন সংবিধান এক নতুন যুগের আহ্বানকে মোকাবিলা করতে পারে। সংবিধান পুরোনো হয়ে গেলে নতুন সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। যার ফলে পুরোনো সংবিধানের সংশোধনের প্রয়োজন হয়। অবশ্য অনমনীয়, সংবিধানের সংশোধন অনিবার্য্য। আমেরিকার সংবিধান ২৬বার সংশোধনের স্থলে, ভারতের সংবিধান ১০৪ বারের বেশী সংশোধন হয়ে গেছে। এই সংবিধান নমনীয় হলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অসুবিধে হয় না।

৬. নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।
৭. জনসাধারণের স্বার্থ ও মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করে।
৮. প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে আইন সম্মত করা হয়।

তুমি জানো কি?
সংবিধান যদি অত্যধিক নমনীয় হয়, তবে ব্যবস্থাপক সভার হাতে খেলনা হয়ে দেশের প্রতি বিপদ ঘনিয়ে আসে।

সংবিধান কেন দরকার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

আমরা কি শিখলাম

- কটি রাষ্ট্রের সুপরিচালনার জন্যে যে মৌলিক আইন আবশ্যক তাকে সেই দেশের সংবিধান বলা হয়।
- সংবিধান প্রণয়ন সভা বা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত সভা দ্বারা লিখিত সংবিধান প্রণয়ন ও অনুমোদন লাভ করে থাকে।
- যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান।
- অলিখিত সংবিধান কোনো সংবিধান প্রণয়ন সভার দ্বারা তৈরী হয় না এবং এটা কোনো লিখিত পুস্তক বা দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় না। এর উৎপত্তি মুখ্যত প্রথা, পরম্পরা ও চালচলনের ওপরে নির্ভরশীল।
- ব্রিটিশ সংবিধান এক অলিখিত সংবিধান।
- যে সংবিধানকে সহজ উপায়ে সংশোধন করা যেতে পারে, তাকে নমনীয় সংবিধান বলা হয়। ব্রিটিশ সংবিধান এক নমনীয় সংবিধান।
- যে সংবিধানের সংশোধন প্রক্রিয়া কষ্টসাধ্য এবং সাংবিধানিক আইন সংবিধানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করা যেতে পারে তাকে অমনীয় সংবিধান বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সংবিধান অনমনীয় সংবিধান।

প্রশ্নাবলী

১. **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

(ক) সংবিধান বলতে কি বোঝো?

(খ) সংবিধানের প্রকার ভেদ লেখো।

(গ) লিখিত সংবিধানের প্রয়োজন কি?

(ঘ) অলিখিত এবং অনমনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ঙ) কোনো রাষ্ট্রে অনমনীয় সংবিধানের আবশ্যকতা আছে এবং কেন?

(চ) নমনীয় সংবিধান দেশের প্রগতির পথে কিভাবে সহায়ক হয়?

২. **'ক' স্তম্ভে লিখিত শব্দগুলি 'খ' স্তম্ভের সম্পর্কিত শব্দের সঙ্গে দাগ দিয়ে জোড়ো।**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অনমনীয় সংবিধান	নমনীয় সংবিধান
নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা	যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা সংবিধান
ব্রিটিশ সংবিধান	বৃহৎ সংবিধান
যুগোশ্লাভিয়া সংবিধান	লিখিত সংবিধান
	অলিখিত সংবিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারত সংবিধানের গঠন প্রক্রিয়া

(১৮৫৮-১৯৪৯)

বিলেতের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এলো। আঙুল প্রবেশ থেকে ধীরে ধীরে পুরো বাহু প্রবেশ করার মতো চালাক ইংরেজরা আস্তে আস্তে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে লাগলো। ভারতীয়দের শোষণ করে তাদের ধনদৌলত নিজের দেশে বয়ে নিয়ে গেলো। ভারতীয়দের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে লাগলো। ১৮৫৭ সালে হিন্দু ও মুসলমান সেপাইরা একত্রিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। যাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়। এই বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাবে অভিহিত। ইংরেজদের শক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হলো। ভারতীয়দের অসন্তোষের সূচনা পেয়ে ইংরেজ সরকার ভারতে কতকগুলি শাসন সংস্কার আনতে চাইলেন।

তুমি জানো কি?

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৮ সালে ভারতে শাসন সম্পর্কিত ঘোষণানামা:

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পরে ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হলো। এই ঘোষণানামার বলে ভারতীয় প্রজারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোনো স্থানে বাস করলেও ব্রিটিশ প্রজাদের মতো সমান সুযোগ সুবিধে ও অধিকার উপভোগ করবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়রা সরকারি চাকরিতে নিযুক্তি পাবেন।

তুমি জানো কি?

- ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনকে বুদ্ধিজীবীরা মাগ্নাকার্টার আখ্যা দিয়েছিলেন।
- সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ ঘোষণানামার বলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে ব্রিটিশ রানীর হাতে গেলো।

১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন:

এই আইনের বলে ভাইসরয়ের এক ইম্পেরিয়াল বিধান পরিষদ গঠন করা হলো এবং এর সদস্যরা ভাইসরয়ের দ্বারা মনোনীত হলেন যার ফলে খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয়রা আইন প্রণয়নের অধিক সুযোগ পেলেন।

> **তুমি জানো কি?**
>
> বম্বে এবং মাদ্রাজ সরকারকে বৈধানিক ক্ষমতা প্রদান করার সাথে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ বিধান পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা রইলো।

১৮৯২ সালের শাসন সংস্কার আইন:

১৮৬১ সালে ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন যে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন হয়েছিলো তার সফল রূপায়ণ হতে পারলো না বলে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন্ প্রকারান্তে প্রকাশ করলেন। ভারতীয়দের দাবী ইংরেজ সরকারের কাছে উপস্থাপন করে ভারতে স্বাধীনতা আনতে ১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্ট্যাভিয়ান হিউমের উদ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হলো। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক বিধান পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রস্তাব দিলেন। ১৮৯২ সালে ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন বলে সর্বোচ্চ বিধান পরিষদ এবং বম্বে ও মাদ্রাস এর মতো প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্ষমতার পরিসরেও বৃদ্ধি ঘটলো।

১৯০৯ সালে মার্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার:

১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাজনের পরে ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য বোঝা গেলো। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো। ১৯০৯ সালে শাসন সংস্কারে প্রথম বারের জন্য মুসলমানেদের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর সুপারিশ করা হলো। ভাইসরয়ের কার্য্যকরী পরিষদ একজন ভারতীয়কে মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হলো। বিধানসভা পরিষদে কার্য্যক্রমের সামান্য পরিবর্তন করা হলো।

> **তুমি জানো কি?**
>
> - উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন।
> - সংরক্ষিত ক্ষমতা গভর্ণরের হাতে রইলো ও হস্তান্তরিত ক্ষমতা ভারতীয় সদস্যদের হাতে রইলো।
> - ১৯১৯ সালে 'রাওলেট অ্যাক্ট' গৃহীত হয়েছিলো। একে 'কালা কানুন' আখ্যা দিয়ে ভারতীয়রা আন্দোলন চালিয়ে গেলেন।
> - ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল মাইকেল ডায়ার গণহত্যা করেছিলেন।
> - ১৯১৯ সালে খিলাফৎ আন্দোলন হয়েছিলো।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন:

১৯১৮ সালে শাসন সচিব মন্টেগু এবং ভাইসরয় চেমসফোর্ড ভারতে এসে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা ১৯১৯ সালে ভারতে শাসন সংস্কার আনতে যেসব প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা ১৯১৯ সালের 'ভারত সংস্কার আইন' বা মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার নামে অভিহিত।

এই সংস্কার আইনে প্রদেশের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রইলো। শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা সকল দুভাগে বিভক্ত করা হলো। যথা—সংরক্ষিত (Reserved) এবং হস্তান্তরিত (Transferred) ক্ষমতা।

> **তুমি জানো কি?**
>
> ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি বৃহত্তম আইন এবং এতে ৩১২টি ভাগ ছিলো।
>
> ১৯৩৫ সালের আইনে ব্রিটিশ সরকারের বিভাজন ও শাসন (Devide & Rule) প্রতিফলিত হয়েছিলো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

- ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করলো। এর বিশেষত্ব নিম্নে দেওয়া হলো।
- এতে ভারতে সংঘীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করার ব্যবস্থা রইলো।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে উক্ত আইনের সংশোধন এবং পরিবর্তন করার অধিকার ন্যস্ত করা হলো।
- ১৯১৯ সালের আইন প্রদেশের হাতে দেওয়া 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' ক্ষমতা বাদ দিয়ে কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতাগুলো 'হস্তান্তরিত' ও 'সংরক্ষিত' ক্ষমতায় ভাগ করা হলো।
- কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলো।
- সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বর ব্যবস্থা রইলো।
- কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিবাদের সমাধান এবং আইনের তর্জমা করার জন্য সংসদীয় ন্যায়ালয়ের ব্যবস্থা রইলো।

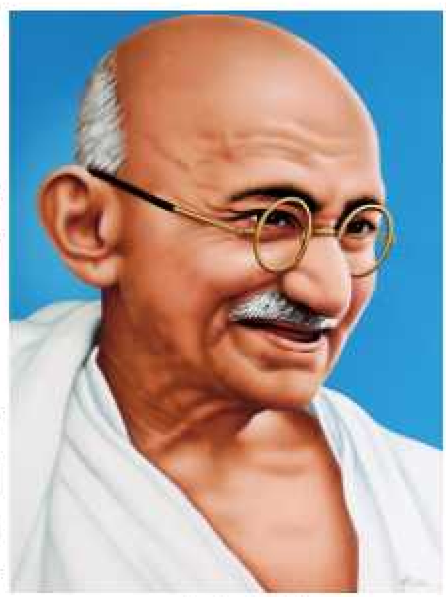

মহাত্মা গান্ধী

১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইন

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতীয়দের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বড়লাট হিসেবে ভারতে ১৯৪৭ সালে এসেছিলেন। তিনি ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, মুসলিম লীগের নেতা এবং ভারতের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে যেসব প্রস্তাব দিলেন তা ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করলো।

> **তুমি জানো কি?**
>
> ১৯৪৭ সালে আগস্ট ১৪ তারিখ পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস পালন করার ক্ষেত্রে, ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

এই ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে:

- ভারতকে বিভক্ত করে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হবে।
- প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য পৃথকভাবে সার্বভৌম ব্যবস্থাপক সভা থাকবে।

- প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বড়লাট নিযুক্তির ব্যবস্থা থাকবে।
- রাজ্যগুলিতে গভর্ণর নিযুক্তি পাবেন।
- ভারতের ব্রিটিশ সরকারের শাসন থাকবে না।

সংবিধান প্রণয়ন সভা (Constituent Assembly)

ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ ক্রমে সংবিধান প্রণয়নের জন্য সংবিধান প্রণয়ন সভা গঠন করা হয়েছিলো। সংবিধান প্রণয়ন সভার সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ এই সভা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। সভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩৮৯ জন ছিলেন।

সংবিধান প্রণয়ন সভা প্রথমে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর ৯ তারিখে বসেছিলো। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সংবিধান প্রণয়ন সভার সভাপতি এবং ডাঃ ভীমরাও আম্বেদকর খসড়া প্রস্তুত কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন। নতুন সংবিধান ১৯৪৯ সালে নভেম্বর ২৬ তারিখে গ্রহণ করা হয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্য্যকারী হয়ে চলেছে।

তুমি জানো কি ?

১৯৪৬ সালে ভারতের পরিস্থিতির সমীক্ষা করার জন্যে বিলেতের তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ভারতে এসেছিলেন। একে 'ক্যাবিনেট মিশন' বলা হয়। এই মিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতে নির্বাচন করে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য সংবিধান প্রণয়ন সভা গঠন করা হয়েছিলো।

১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারত সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রস্তাব অবজেক্টিভ রিজেল্যুসন এনেছিলেন। এতে ভারতের সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূচনা পাওয়া যায়।

আমরা কি শিখলাম

- ১৯৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
- ১৯৫৮ সালের মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা নামার বলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর থেকে ক্ষমতা মহারানীর হস্তে গেলো।
- ১৯৬১ সালে ভারতীয় পরিষদ আইনের বলে ইম্পেরিয়াল বিধান পরিষদ গঠিত হলো।
- ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হলো।
- ১৮৯২ সালে শাসন সংস্কার আইনের বলে প্রদেশের বিধান পরিসর বৃদ্ধি করা হলো।
- ১৯০৯ সালে মার্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার দ্বারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলন করা হলো।
- ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা দ্বৈত শাসন প্রচলিত হলো।

- ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ভারতে সংঘীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করার ব্যবস্থা রইলো।
- ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আইনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য লোপ পেয়ে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি আলাদা আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টি করার ব্যবস্থা থাকলো।
- সংবিধান প্রণয়ন সভার দ্বারা ভারতের নতুন সংবিধান তৈরী হলো।

প্রশ্নাবলী

১ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে কোন শাসন আইন বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? পাঁচ লাইনে লেখো।

২. ১৯৫৭ সালের সেপাই বিদ্রোহের তাৎপর্য্য কি? সংক্ষেপে বোঝাও।

৩. মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা নামার বলে ভারত শাসনে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিলো?

৪. দ্বৈত শাসন কি?

৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের নতুন সংবিধানকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

৬. ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ভারতকে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়াতে কিভাবে সহায়ক হলো?

৭. **সংশোধন করে লেখো।**

(ক) ১৯১৯ সালের ভারত সংস্কার আইনের বলে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভারতীয়রা সরকারী চাকরীতে নিযুক্তি পেতে পারবে।

(খ) ১৯৮২ সালের শাসন সংস্কার আইনের বলে কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদের সমাধান করার জন্য ন্যায়ালয়ের ব্যবস্থা রইলো।

(গ) ১৮৬১ সালের শাসন আইনের বলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা আর থাকলো না।

(ঘ) ভারতের নতুন সংবিধান ১৯৪৯ সালের নভেম্বর ২৬ তারিখ থেকে কার্য্যকরী হয়ে আসছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

(Basic Features of Indian Constitution)

১৯৪৬ সালে ভারতের অবস্থা অনুধ্যান করে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়ন সভা (*Constitutent Assembly*) গঠনের জন্য জুলাই মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর ৯ তারিখ থেকে ১৯৪৯ সাল নভেম্বর ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত সংবিধান প্রণয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ভারতের নতুন সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্য্যকর হয়ে আসছে।

ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করার সময় সংবিধান প্রণয়ন সভা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান অনুধ্যান করেছিলো।

ভারতীয় সংবিধানের অনেকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলো নিচে দেওয়া হলো।

তুমি জানো কি ?

- সচ্চিদানন্দ সিন্হার সভাপতিত্বে এই সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে বসেছিলো।
- এর স্থায়ী সভাপতি হিসেবে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।
- ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর খসড়া প্রণয়ন কমিটির (Drafting Commitee) অধ্যক্ষরূপে নিযুক্তি পেলেন।
- সংবিধান প্রণয়নসভা ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন ধরে কাজ করে এই ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন।
- ব্রিটিশ, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি ও অষ্ট্রেলিয়ার সংবিধান ভারতের সংবিধানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

প্রাক্‌কথন (Preamble):

প্রত্যেক লিখিত সংবিধানে প্রস্তাবনা থাকে। একে সংবিধানের মুখবন্ধ ও জাতক বলে বলা যেতে পারে। এতে সংবিধানের আভিমুখ্য প্রকাশিত হয়।

আমাদের সংবিধানে প্রস্তাবনা এই রকম।

প্রাক্‌কথন বা প্রস্তাবনা:

আমরা ভারতবাসী ভারতকে সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রভাবে গঠন করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও ভারতের নাগরিকদের

- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়;
- চিন্তা, অভিব্যক্তি, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বতন্ত্রতা;
- স্থিতি ও সুবিধার সুযোগের সমানতার সুরক্ষা প্রদান করতে তথা
- ব্যক্তি মর্য্যাদা এবং রাষ্টের ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব উৎসাহিত করতে এই ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর তারিখে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন সভায় এতদ্বারা এই সংবিধানকে গ্রহণ ও প্রণয়ন করিতেছি এবং নিজেকে অর্পণ করিতেছি।

ভারত একটি **সার্বভৌম** রাষ্ট্র হওয়ায় এই রাষ্ট্র বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সমাজবাদী রাষ্ট্র হওয়ায় দারিদ্র্য দূরীকরণ এর মূল লক্ষ্য।

এক **ধর্মনিরপেক্ষ** রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব ধর্মই সমান।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বললে যেখানে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করা হয়।

সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র বললে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান বংশানুক্রমিক নীতিতে শাসন ক্ষমতায় আসেন না। তিনি নির্বাচিত হন।

ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

ভারতীয় সংবিধান খসড়া প্রণয়ন কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ আম্বেদকর, তাঁকে আধুনিক ভারতের মনু এবং ভারতের সংবিধানের পিতা বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি ১৮৯১ সালে ১৪ই এপ্রিল মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি উপখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতে মাহার ছিলেন। দলিত জাতির লোকেদের উত্থানের জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। তাঁর প্রকৃত নাম আম্বা ভাদেকরকে শ্রেণী শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী আম্বেদকর করা হয়েছিলো।

তুমি জানো কি?

- বিশিষ্ট সংবিধানবিদ পাল্কিওয়ালার ভাষায় এই প্রস্তাবনা এক পরিচয় পত্র (*Indentify Card*)।
- ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বিশেষ বলে ঘোষণা করেছিলেন।
- ১৯৫০ সাল থেকে কার্য্যকরী হয়ে আসা সংবিধান প্রথম বারের জন্যে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রস্তাবনায় তিনটে শব্দ যুক্ত করা হয়েছে যথা: সমাজবাদী (*Socialist*), ধর্মনিরপেক্ষ (*Secular*) এবং সংহতি (*Integrity*)।

❖ সার্বভৌম, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের বিপরীত শব্দগুলো লেখো।

❖ তোমার বিধান মণ্ডলী (Constituency) থেকে ওড়িশার বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধির নাম কি?

লিখিত সংবিধান (Written Constitution):

সংবিধান প্রণয়ন সভা ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন ধরে বিভিন্ন দেশের সংবিধান অধ্যয়ন করে বিশেষ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে রাজত্বকালীন প্রণীত ১৯৩৫ সালের শাসন খসড়াকেও বিশ্লেষণ করে ভারতের জন্য এক দীর্ঘ ও বৃহত্তম সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এই মূল সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা, ৮টি অনুসূচী এবং ২২টি ভাগ ছিলো। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সংবিধানে কেবলমাত্র ৭টি ধারা আছে।

সংবিধানবিদ এম-ভি পাইলি ভারতের সংবিধানের আকারকে এক হাতীর শরীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের মিশ্রণ (Mixture of Flexible and Rigid Constitution):

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে সংবিধানের সংশোধন প্রণালী অনুযায়ী সংবিধানকে নমনীয় এবং অনমনীয় শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধন প্রণালী জটিল হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কয়েকটি ধারা কেবল সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা সমর্থনের দ্বারা সংশোধন করা হয়ে থাকে। এই কারণে ভারতের সংবিধানকে নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের মিশ্রণ বলা হয়।

❖ যে সংবিধানের সংশোধন প্রণালী জটিল ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করা যায়, তাকে অনমনীয় সংবিধান বলা হয়। কিন্তু যে সংবিধানে সাংবিধানিক আইন এবং সাধারণ আইনের সশোধন প্রণালীতে কোনো পার্থক্য থাকে না এবং এর সংশোধন প্রণালী সহজ সরল তাকে নমনীয় সংবিধান বলে।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা (Parliamentary Form of Government):

সংবিধান প্রণেতাগণ ব্রিটিশ সংবিধানের অনুকরণে (যদিও অবিকল নয়) ভারতকে একটি সংসদীয় রাষ্ট্রে তৈরী করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলো এইরকম:

১. একটি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় দুজন মুখ্য থাকেন। একজন নামেই রাষ্ট্র মুখ্য হলে অন্যজন বাস্তবে সরকারের মুখ্য হন।

ব্রিটেনের রাজা বা রানী রাষ্ট্রের প্রধান হলেও প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান হন। সেইরকম ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হলেও প্রধানমন্ত্রী শাসনের প্রধান হন। রাষ্ট্র মুখ্য নামকে মাত্র মুখ্য রাখলে প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই কার্যকরী হয়।

২. একটি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কার্য্যপালিকা ও ব্যবস্থাপিকার মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়।

৩. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডল তাঁদের শাসনকার্য্যের জন্য সংসদের নিম্নসদনে এবং ভারতের লোকসভার কাছে উত্তর দিতে দায়ী থাকবে।

৪. মন্ত্রী পরিষদের কার্য্যকাল নিম্ন সদনের গরিষ্ঠ সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।

৫. সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে বাছেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও, ভারত এক সংঘীয় রাষ্ট্র নয় কেন? অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

যদি লোকসভা মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে এবং তা গৃহীত হয় তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। যদিও তাঁদের কার্য্যকাল সাধারণত ৫ বছর, কার্য্যকাল শেষ না হলেও সংসদের নিম্ন সদন চাইলে সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই কার্য্যকাল সম্পূর্ণ হয়। ১৯৯০ সালে নভেম্বর ৭ তারিখ ভি. পি. সিংহ সরকারের পতন এই প্রক্রিয়াতে প্রথম বার হয়েছিলো।

কেন্দ্রাভিমুখী সংঘীয় ব্যবস্থা (Federal with Unitary Features):

ভারতের সংবিধানে কোথাও ভারত সংঘীয় রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা না হলেও ভারত একটি সংঘীয় রাষ্ট্র।

একটি সংঘীয় রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত লক্ষণ সব দেখতে পাওয়া যায়।

১. লিখিত অনমনীয় সংবিধান।

২. দ্বৈত শাসন।

৩. কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন।

৪. স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ন্যায়ালয়।

ভারতে উপরিলিখিত ব্যবস্থা সকল পরিলক্ষিত হয় বলে সংঘীয় রাষ্ট্র পদবাচ্য।

কিন্তু অধ্যাপক কে. সি. হোয়ারের মতে ভারত সংঘীয় রাষ্ট্র হলেও সংবিধানে কেন্দ্র সরকার বেশী শক্তিশালী হয়ে রয়েছেন। সেই কারণে একে অর্ধসংঘীয় বলে (*Quasi Federation*) আখ্যা দিয়েছেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হওয়ায় রাজ্যরা কি সুবিধে পেয়েছে, আলোচনা করে লেখো।

ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতির নাম কি? এবং বর্তমানের প্রধান বিচারপতি কে? আলোচনা করে লেখো।

একটি সংঘীয় রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হয়ে থাকলেও নিম্নলিখিত কারণের জন্য ভারতে সংঘীয় রাষ্ট্রকে সংবিধানবিদরা কেন্দ্রাভিমুখী সংঘীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন।

১. কেন্দ্র সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনে রাজ্যদের রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়বস্তুর ওপরে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হলেও, জরুরী পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকার রাজ্য তালিকাভুক্তর বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

২. রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে প্রত্যেক রাজ্যে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হয়ে কার্য্য করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করেন এবং প্রয়োজনে বরখাস্তও করেন।

৩. যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান থাকায়, ভারতে একটাই সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার মতো সংঘীয় রাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা থাকার বেলায় ভারতে জনসাধারণ একক নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। আমরা সবাই ভারতীয় নাগরিকত্বই শুধু গ্রহণ করি।

তুমি জানো কি?

আমাদের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্টগুলো, ইংল্যান্ডের ঐকিক সংসদীয় গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সংঘীয় রাষ্ট্র সংবিধানের সংমিশ্রণ।

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার মতো আমাদের দেশে রাষ্ট্র সংঘীয় ব্যবস্থা থাকলেও ব্রিটেনের মতো কিছু ঐকিক ব্যবস্থাও দেখা যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State):

ভারতের কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করেন এবং তারা যেকোনো ধর্ম গ্রহণ করে এর প্রচার ও প্রসার করতে পারেন। ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারে ২৫ ধারা থেকে ২৮ ধারা পর্য্যন্ত ধর্মগত অধিকার দেওয়া আছে। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন আইন অনুসারে সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble)তেও ভারতে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের বিরোধাচরণ করে না।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights):

একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করে। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১২ থেকে ৩৫ ধারা পর্য্যন্ত ৭টি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থা অনুসারে ৭টি অধিকার থেকে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে পৃথক করে আইনগত অধিকাররূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ বর্তমানে মাত্র ৬টি মৌলিক অধিকার ভোগ করছেন। সেগুলো হলো:

১) সমানতার অধিকার (Right to Equality)
২) স্বাধীনতার অধিকার যা (Right to Freedom)
৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)
৪) ধর্মগত স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)
৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার (Cultural & Educational Rights)
৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

উক্ত মৌলিক অধিকারগুলো দেশের স্বার্থের দৃষ্টিতে কখনো কখনো নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নাগরিকরা প্রথম ৫টি অধিকার ভোগ করেন এবং কোনো অবস্থায় সরকার কিংবা কোনো ব্যক্তি সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন তবে সাংবিধানিক অধিকারের বলে প্রতিকারের জন্য ব্যক্তি বিচারের আশ্রয় নিতে পারবে। সর্বোচ্চ বিচারালয় কিংবা উচ্চ বিচারালয়ে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক প্রতিকার অধিকার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তুমি জানো কি?

২০০২ সালে সংবিধান সংশোধন করা হয়ে ধারা ২১ (ক)তে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত শিশুকে বিনা পয়সায় ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা মৌলিক অধিকারের একটি অংশ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

যদুনাথ ও সৌমিত্র দুজন দশম শ্রেণীর ছাত্র। দুজনেই বোর্ডের অধীনে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়েছিলো। শিক্ষকের মতে দুজনে খুব ভালো ছাত্র এবং শ্রেণীর পরীক্ষায় ভালো নম্বর রাখে। পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখা গেল যদুনাথ ৯৮ শতাংশ নম্বর রেখেছে যেখানে সৌমিত্র ৩৮ শতাংশ নম্বর রেখে আশ্চর্য্য হয়ে খুব দুঃখিত হয়ে পড়লো। সৌমিত্র ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে চাইলো। তবে প্রশ্ন হচ্ছে যে সংবিধানের কোন মৌলিক অধিকার উল্লঙ্ঘন বলে সে ন্যায়ালয়ের আশ্রয় নেবে?

চগলার বয়স দশ বছর। ছোটবেলায় সে বাপ মাকে হারিয়েছে। এর বাড়ী তার বাড়ীতে ফাইফরমাস করে তার পেট চলে যায়। গুলি খেলে ও ঘুড়ি উড়িয়ে তার সময় কেটে যায়। দেখতে দেখতে তার দশ বছর বয়স হয়ে গেলো। ভীমসেনের ভুবনেশ্বরের মাষ্টার ক্যান্টিনের মোড়ে একটা ছোট খাবারের দোকান আছে। চগলাকে ডেকে নিয়ে তার দোকানে কাজকর্ম করিয়ে দুবেলা খেতে দিলে সে বাসন পত্র মাজে, টেবিল পোঁছে। একদিন হাকিম সাহেব ভীমসেনকে ডেকে এনে দণ্ডবিধান দিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন অপরাধে এবং কোন অধিকার উল্লঙ্ঘন করার ফলে ভীমসেনকে হাকিম সাহেব দণ্ডবিধান দিলেন?

রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of Sate Policy):

ভারত সংবিধানের চতুর্থ ভাগে ৩৬ থেকে ৫১ ধারা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রে নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক ও আর্থিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশমূলক নীতিকে মুখ্যত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

যথা: ১) সমাজবাদী নীতি
২) উদারবাদী নীতি
৩) গান্ধীবাদী নীতি

১) **সমাজবাদী নীতি:** সম্পত্তি কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে জমা হয়ে না থেকে সম্পত্তির সুষম বণ্টন করা হবে।

- মহিলা ও পুরুষদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান।
- বৃদ্ধ, রুগী ও অক্ষম লোকেদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে।
- রাষ্ট্র সবার বেঁচে থাকার মান উন্নত করার সাথে সাথে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে দৃষ্টি প্রদান করবে।

২) **উদারবাদী নীতি:**

- ন্যায়পালিকা থেকে কার্য্যপালিকাকে পৃথক করা।
- রাষ্ট্রের সমস্ত জনসাধারণের জন্য একই প্রকার দেওয়ানি আইন প্রচলন করা।
- গুরুত্বপূর্ণ সৌধগুলির সুরক্ষা করা। (স্থান এবং পীঠ)
- প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

৩) **গান্ধীবাদী নীতি:**

- গান্ধীবাদের কিছু প্রভাব রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিতে প্রতীয়মান হয়। যথা-
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপন।
- কুটির শিল্পের বিকাশ
- অনুসূচিত জাতি ও জনজাতির লোকেদের জন্য বিশেষ যত্ন।
- গো-হত্যা নিষেধ।

রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি ভারতকে এক জনমঙ্গল ও আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে উদ্দিষ্ট।

মৌলিক অধিকারের সুরক্ষার জন্য ন্যায়ালয়ের আশ্রয় নেওয়া যাবে, কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিতে বর্ণনা করা ব্যবস্থাগুলো কার্য্যকরী না হলে কোনো ন্যায়ালয়ের আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

তুমি জানো কি?

মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার স্থলে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি সামাজিক ও আর্থিক অধিকার প্রদান করছে।

তুমি জানো কি?

ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে গোলকনাথ মামলায় মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়ার স্থলে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে উক্তনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ন্যায়ালয়ের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary):

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক তথা দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতা পাবার হকদার। কিন্তু কখনো কখনো সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অগণতান্ত্রিক।

ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট)

ভারতের নাগরিকরা মৌলিক অধিকার ভোগ করেন এবং সেই মৌলিক অধিকারগুলোর সুরক্ষা দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। সর্বোপরি ভারতের মতো একটি সংঘীয় রাষ্ট্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়কে 'সংবিধানের রক্ষক' বলে বলা হয়। বিচার ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য বিচার ব্যবস্থা কেবল স্বাধীন না হয়ে নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ন্যায়পালিকা, ব্যবস্থাপিকা ও কার্য্যপালিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন হওয়া আবশ্যক।

তুমি জানো কি?

ভারতের বিচারপতিদের নিযুক্তি ও বহিস্কার পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা, আকর্ষণীয় বেতন, দীর্ঘকার্য্যকাল, বিচার ব্যবস্থায় স্বাধীনতায় বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

ভারতের উচ্চ ন্যায়ালয়ের (High Court) বিচারপতিগণ ৬২ বছর বয়সে এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ ৬৫ বছর বয়সে অবসর নেন।

সর্বজনীন সাবালক ভোট প্রথা (Universal Adult Franchise):

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাবালকদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে। সংবিধানের ৩২৬ ধারা অনুসারে ভোট দাতার বয়স ২১ বছর ছিলো। পরে একে পরিবর্তন করে বর্তমানে ১৮ বছর করা হয়েছে।

একক নাগরিকতা (Single Citizenship):

ভারতে বসবাস করা সমস্ত জনসাধারণ কেবল ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার মতো সংঘীয় রাষ্ট্রে বাস করা জনগণ প্রথমে, যে রাজ্যে বাস করেন সেই রাজ্যের নাগরিক এবং তাঁর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকার নাগরিক হন।

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার মতো সংঘীয় রাষ্ট্র হলেও রাজ্যে বাস করা অধিবাসী সে রাজ্যের নাগরিক নন, সবাই ভারতীয় নাগরিক।

- তোমার নিজের অঞ্চলে কি কি উন্নতিমূলক কার্য্য করা যেতে পারে, তার থেকে তিনটি উদাহরণ দাও।
- জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি ব্যতীত সংবিধানের কোনো স্থানে এর বিশেষত্বর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে কি?
- ২৬শে নভেম্বর ২০০৮ সালে প্রতিবেশী দেশের কিছু আতঙ্কবাদী মুম্বই শহরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত তাজ হোটেল ও ছত্রপতি শিবাজী রেল স্টেশনে চোখ বুজে গুলি চালানোয় অনেক নিরীহ জনসাধারণ মৃত্যুবরণ করেছিলো। এ ধরনের নারকীয় ও হৃদয়বিদারক ঘটনার পরেও আমরা ভারতবাসী প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় আগ্রহী। উক্ত বন্ধুত্ব স্থাপন রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত?

মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties):

ভারতীয় নাগরিকরা ১৯৭৬ সাল থেকে দশটি মৌলিক কর্তব্য ভোগ করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে ভারতের নাগরিকদের ১১টি মৌলিক কর্তব্য আছে। ৫১ (ক) ধারায় সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংহতিকে সম্মান করা, ভারতের সার্বভৌমত্ব একতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখা, ভারতীয় সংস্কৃতির সুরক্ষা করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা, মানবিকতা ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, জাতীয় সম্পত্তির সুরক্ষা প্রভৃতি মৌলিক কর্তব্যে স্থান পেয়েছে এবং পরিশেষে ২০০২ সালে যে কর্তব্যটি স্থান পেলো তা বর্তমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেদের শিক্ষাদান অভিভাবকের মৌলিক কর্তব্য।

তুমি জানো কি?

১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের ৫১(ক) ধারায় ১০টি মৌলিক কর্তব্যগুলি স্থান পেয়েছে।

২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা আরও একটি মৌলিক কর্তব্য যোগ করে ১১টি মৌলিক কর্তব্য হয়েছে।

আমরা কি শিখলাম

- ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য:
- ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনা ১৯৭৩ সাল থেকে সংবিধানের একটি অংশ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভারতের সংবিধান, সংবিধান সভার দ্বারা প্রস্তুত হয়েছে।
- ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান।
- ভারতের সংবিধান নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধানের মিশ্রণ।
- ভারতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত।
- ভারত এক সংঘীয় রাষ্ট্র হলেও ঐকিক রাষ্ট্রের কিছু গুণাগুণ ভারত শাসনে পরিলক্ষিত হয়।
- ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।
- ভারতীয় নাগরিকদের ৬টি মৌলিক অধিকার আছে।
- সংবিধানের ৪র্থ ভাগে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি প্রদান করা হয়েছে।
- ভারতের ন্যায়িক ব্যবস্থা স্বাধীন।
- ভারতে ১৮ বছরে পদার্পণ করা নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার আছে।
- নাগরিকদের ভারতবর্ষে দেশের প্রতি কয়েকটি কর্তব্য আছে।

প্রশ্নাবলী

১. ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনা কেন স্থান পেয়েছে?

২. ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান হলেও সংবিধানে থাকা দুটি অলিখিত বিষয় বস্তুর উদাহরণ লেখো।

৩. ভারতের সংবিধানে কতগুলি অংশ নমনীয়—এর তিনটি উদাহরণ দাও।

৪. ভারতকে কেন সংঘীয় রাষ্ট্র বলা হয়? এর তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫. ভারতকে কেন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়? ধর্ম নিরপেক্ষ না হওয়া একটি রাষ্ট্রের নাম লেখো।

৬. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার কি? তিনটি লাইনে বুঝিয়ে লেখো।

৭. একক নাগরিকতা বলতে কি বোঝায়, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে একক নাগরিকতা আছে?

উত্তর দাও:

৮. ভারতের সংবিধানের পিতা কাকে বলা হয়?

৯. একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের উদাহরণ দাও।

১০. ১৯৭৬ সাল থেকে কি সব শব্দ সংবিধানের প্রস্তাবনায় যোগ করা হলো?

১১. ভারত সংঘীয় রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিবাদ হলে কে সমাধান করেন?

১২. ভারতীয় সংস্কৃতির সুরক্ষা করার দায়িত্ব সংবিধানের কোন ধারায় স্থান পেয়েছে?

চতুর্থ অধ্যায়

মানবিক অধিকার

(Human Rights)

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ২০০১ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর আতঙ্কবাদীর দ্বারা ধ্বংস ও ২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের বম্বে নগরীর তাজ হোটেলে থাকা নিরীহ নাগরিকদের ওপরে আতঙ্কবাদীদের দ্বারা চোখ বুজে গুলি চালানো, মানবিক অধিকারের উল্লঙ্ঘন বলে ধরা হয়।

আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র

তাহলে মানবিক অধিকার কি?

জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ সরকারের প্রকারভেদ নির্বিশেষে একজন মানুষ ধরাপৃষ্ঠে জন্ম নেওয়া থেকে আনন্দে মানুষের মতো বাঁচার জন্য তার যে অধিকার সেই অধিকারকে মানবিক অধিকার বলা হয়। বিংশ শতাব্দীতে এটা সর্বজনীন মান্যতা পেয়েছে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা অধিক অধিকার ভোগ করার সময়ে একটি

মুম্বই নগরীতে তাজ হোটেলে আতঙ্কবাদী আক্রমণ

স্বেচ্ছাচারী কিংবা একচ্ছত্রবাদী রাষ্ট্রে জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত কম অধিকার ভোগ করেন। গণতন্ত্র হোক বা একচ্ছত্রবাদী রাষ্ট্র হোক, মানুষের মানুষের মতো আনন্দে জীবন যাপন করার অধিকার রয়েছে। সমাজে বাস করা ব্যক্তিদের শোষণকে এটা বিরোধ করে।

তুমি জানো কি?

১২১৫ সালের বিলেতের 'মাগ্নার্কাটা' ১৯৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা নামা, ১৭৮৯ ফ্রান্সের মানবিক অধিকার ঘোষণা, মানবিক অধিকাররূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

মানবিক অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Human Rights):

মিলিত জাতিসংঘের সনদ্ (Charter) যা কি ১৯৫৪ সালে গ্রহণ করা হয়েছিলো এবং ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৪ সাল থেকে কার্য্যকরী হলো, তাতে আন্তর্জাতীয় সহযোগ, ভ্রাতৃভাব ও মানবিক অধিকারের ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মানবিক অধিকারের ওপরে আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিলিত জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণা করা হলো।

পৃথিবীতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রয়োগে বিকাশশীল রাষ্ট্ররা বিকশিত রাষ্ট্রের হাতে শোষণের ফলে বিকাশশীল রাষ্ট্রের মানুষগণ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র দ্বারাই যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তাই নয়, এমনকি জনসাধারণকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে থাকা পুলিশ প্রশাসনও অনেক সময় বন্দীদের সুরক্ষা দেওয়ার বদলে নিষ্ঠুর, বর্বর, নৃশংস ব্যবহার করেন যার ফলে আমরা সংবাদপত্রে 'থানা হাজতে বন্দীর মৃত্যু' শীর্ষক সংবাদ পড়ি।

তুমি জানো কি?

প্রত্যেক বছর ১০ই ডিসেম্বর মানবিক অধিকার দিবসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং পালিত হচ্ছে।

১৯৯৩ সাল থেকে জাতীয় মানবাধিকার আয়োগ এবং ২০০৩ সাল থেকে আমাদের রাজ্যে মানবাধিকার আয়োগ কাজ করছে।

সেই রকম আন্তর্জাতীয় আতঙ্কবাদ, মানবিক অধিকারের প্রতি যেন এক আহ্বানরূপে দেখা দিয়েছে। যার শিকার নিরীহ জনসাধারণ হচ্ছেন।

সাম্প্রতিককালে মহিলা, শিশু ও নিম্নবর্গের মানুষদের মানবিক অধিকার উল্লঙ্ঘন হচ্ছে বলে মতামত দেওয়া হচ্ছে।

বিকাশশীল রাষ্ট্রে কিভাবে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

নারীর অধিকার (Women's Rights):

নারীদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত। নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, যৌতুকজনিত হত্যা, কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো অনেক ঘটনা আজকাল সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুরুষের মতো নারীও সমাজের এক বলিষ্ঠ অঙ্গ। নারী ভগ্নী, সে জায়া, সে জননী। নারীর সমৃদ্ধি হলে সমাজের অভিবৃদ্ধি হবে। একটি সন্তানের বাল্যশিক্ষা মায়ের কোল থেকেই আরম্ভ হয়। তাই নারীদেরকেও পুরুষদের মতো সমাজে সমান অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রেও নারীরা বিশেষ অধিকার পাওয়া আবশ্যক।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে উভয় পুরুষ এবং নারী দেবতা একত্রে পুজো পান। যথা—শিব পার্বতী, রাম সীতা, নারায়ণ লক্ষ্মী, কৃষ্ণ রাধা ইত্যাদি। নারীরা পুরুষের থেকে কোনো গুণেই কম নন।

ভারতের সংসদে নারীদের বিশেষ স্বাধীনতার জন্য সংসদ এবং বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিচারাধীন আছে কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা আছে।

তুমি জানো কি?

ভারতের ১৯৭৬ সালের সমান মজুরীর আইনে একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষ সমান মজুরী পাবে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ভারত স্বাধীন হলো সত্যি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার আসল স্বাদ আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যখন ভারতে একজন নারী মাঝরাতে একাকী রাস্তায় হেঁটে যাওয়া আসা করতে পারবে।

নারীদের কেন অধিকার পাওয়া আবশ্যক, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

শিশু অধিকার (Child Rights):

শিশু হাসলে দুনিয়া হাসে। আজকে যে শিশু কাল সে দেশের নাগরিক। রাষ্ট্র নির্মাণে সে নিজেকে হরিয়ে ফেলবে। নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে। কুঁড়িটিকে ফুল হয়ে ফোটা পর্য্যন্ত সমস্ত সুযোগ দেওয়া আবশ্যক।

৬ বছর থেকে ১৪ বছরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী শিশু বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপযুক্ত খাদ্য, ক্রীড়া এবং আমোদ-প্রমোদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের জন্যে তাদের অধিকার সাব্যস্ত করা এক দিবা স্বপ্ন। ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা ৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্য্যন্ত সমস্ত শিশুকে বিনা পয়সায় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং মৌলিক অধিকার রূপে গ্রহণ করা হয়েছে

এবং শিশুদের শিক্ষা দান অভিভাবকদের মৌলিক কর্তব্য বলে, ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্যতে উপরোক্ত সংশোধন দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ১৪ বছরের কম ছেলেদের খনি ও কঠিন কাজে নিযুক্ত করার ওপরে মৌলিক অধিকারে নিষেধ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের অনুরোধে যদি বিদ্যালয়ে টেলিভিশনের সুবিধে থাকে, তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ নিশ্চয়ই দেওয়া আবশ্যক। প্রথমটি 'তারে জামিন পর' অন্যটি 'স্লামডগ মিলেনেয়ার'। শিক্ষকরা ছেলেদের উক্ত চলচ্চিত্র বোঝানোর পর ছেলেরা এর ওপরে টিপ্পনী লিখবে।

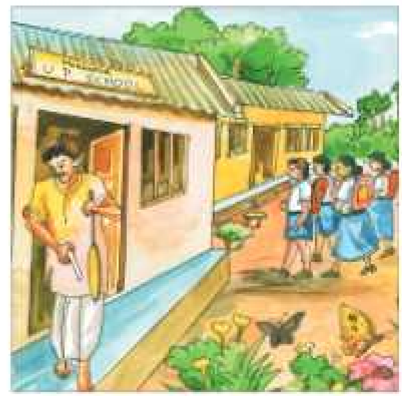

নারী সশক্তিকরণ (Women Empowerment):

'নারীশক্তি জিন্দাবাদ'—এটাই হচ্ছে নারী সশক্তি করণের স্লোগান।

ভারতে পুরুষ প্রধান সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভারতীয় সমাজে পুরুষদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। একটি মেয়ে বিয়ের পরে বাপের বাড়ী ছেড়ে স্বামীর বাড়ী আসে। তাকে স্বামীর কথা মানতে হয়। আত্মীয় বা পরিবারে মায়ের চেয়ে বাবার প্রাধান্য বেশী।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী প্রতিভা সিংহ পাটিল

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, লড়াই করেছিলেন। দেশের বহু নারী স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। হলে কি হবে তখন নারী শিক্ষার প্রসার ছিলো না।

প্রত্যেক বছর ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতীয় মহিলা দিবস এবং মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মাতৃদিবসরূপে পালন করা হয়।

বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার সমাজকে কলুষিত করার সঙ্গে নারীদের স্বাধীনতা সংকুচিত করেছিলো। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবা ফুলে, স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা গান্ধীর মতো মনীষীগণ সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে নারীদের পুরুষের সমকক্ষ করার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম মহিলা I.P.S. অধিকারী
শ্রীমতী কিরণ বেদী

যুগ বদলেছে। ভারতীয় নারী আজ আর অবলা-দুর্বলা নয়। সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে নারী আজ তার মহত্ত্ব প্রতিপাদন করতে পিছপা নয়। রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থা, প্রভৃতিতে নারী আজ আগুয়ান এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ।

যে কোনো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় সংবাদপত্রে বিশেষভাবে নারী বা বালিকার ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমতী প্রতিভাদেবী সিং পাটিল, শ্রীমতী অনিতা দেশাই, অরুন্ধতী রায়, শ্রীমতী কিরণ বেদী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু, নন্দিনী শতপথী, শ্রীমা, পি. টি. উষা, কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়াম, সানিয়া মির্জা, শকুন্তলা দেবী, মাদার টেরেসা, মালেশ্বরী, লতা মঙ্গেশকর প্রমুখ মহিলাগণ নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা লাভ করেছেন। সমাজের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

বর্তমান সরকার সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নারীর সুরক্ষা নিমত্তে জননী সুরক্ষা যোজনার মতো অনেক যোজনা হাতে নিয়েছেন।

হিন্দু সংস্কৃতিতে মা'কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শারদীয়া উৎসব দুর্গাপুজো, আলোর উৎসব দীপাবলীতে মা দুর্গা ও মা কালীর আরাধনা করা হয়।

তুমি জানো কি ?

১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে পালন করা হয়েছিলো। হালে জার্মান লেখিকা হার্তম্যুলার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং ব্রিটিশ ঔপন্যাসিকা হিলারী মন্টেল্যান বুকার বিজেতা হয়েছেন।

আমেরিকার এলিনর ওস্ট্রম হচ্ছেন প্রথম মহিলা যিনি অর্থশাস্ত্রে সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

নারী সকল শক্তির আধার বললে অত্যুক্তি হবে না। মাতৃশক্তি বিনা সৃষ্টি অসম্ভব। কথায় আছে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

মাদার টেরেসা

কিরণ বেদী, সুনীতা উইলিয়াম, ও কে মালেশ্বরী কোন কোন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছেন, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

আমরা কি শিখলাম

- পৃথিবীতে সব মানুষের মানুষের মতো বাঁচার অধিকার আছে। একে মানবাধিকার বলা হয়।
- ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছিলো।
- নারীরা সমাজে অবহেলিত হওয়া অনুচিত। পুরুষদের মতো নারীদেরও সমান স্বাধীনতা অধিকার দেওয়া আবশ্যক।
- শিশুরা নির্যাতিত হওয়া সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং শিশুদের শোষণ না করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে ব্যবস্থা আছে।
- আধুনিক যুগে নারী সর্বক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছেন।

প্রশ্নাবলী

১. মানুষকে অধিকার দেওয়ার তাৎপর্য্য কি ? পাঁচ লাইনে লেখো।

২. একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পাঁচটা মানবিক অধিকার লেখো।

৩. নারীরা পুরুষের মতো অধিকার ভোগ করার পেছনে তিনটি বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন করো।

৪. শিশুদের বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা মৌলিক অধিকারে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো ? পাঁচ লাইনে লেখো।

৫. কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী শিক্ষার প্রসার ও অধিকারের জন্য স্বর উত্তোলন করেছিলেন লেখো।

উত্তর দাও:

৬. কবে সর্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণা করা হলো ?

৭. শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে কোন নতুন অধিকার সংবিধান সংশোধন করে যোগ করা হয়েছে ?

৮. বইয়েতে দেওয়া নারী সশক্তিকরণের উদাহরণ ব্যতীত আরও দুজন নারী, যাঁরা তাদের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছেন লেখো।